ভালবাসার মুখ

আশাপূর্ণা দেবী

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ সাল।

বাণেশ্বরপুর, আমতা,

হাওড়া।

দুটো লোহার শিকের মাঝখানের ফাঁকে মুখটা চেপে ধরার দ ন
ালে খাঁজ পড়ে ওয়ার মত দাগ বসে যাচ্ছে, তবু সাগর আবো
। ধরছে মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, পারলে ওই সরু ফাঁকা
টুকু দিয়ে সব মাথাটাই গলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে দেখতো নীচের
়।

অথচ দৃশ্যটা এমন কিছুই নয়।

একটা আধবুড়ো লোক বাগানে ঘুরে ঘুরে বোধ হয় সার
চ্ছে।

লের বাগান নয়, সব্জীর বাগান। এখন এই গরমের সময়
বা ফলছে কপিও নয়, মটরশুঁটিও নয়, চকচকে টোম্যাটো
চলে বেগুনও নয়, নেহাৎই ঢ্যাড়শ ঝিঙে বরবটি। তবু যত্নের
নেই। কিন্তু সেটা আশ্চর্য নয় ...।

...র চোখ ... ... সম্পর্কে
তূহল আছে ওর, কৌতূহল ... ওই লোকটা সম্পর্কে।

লোকটার পরনে একটা রং-জ্বলা খাকি হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা
মোজাবিহীন পায়ে একজোড়া ভারী গামবুট, আর মাথায়
ঞ্চলের পেটেন্ট তালপাতার হ্যাট।

ছেলেবেলায় এ হ্যাট দেখেছে সাগর, মা যখন মেলার সময়-টময়
র বাড়ি আসতো, সাগরের জন্যে কিনে নিয়ে যেত। কুসমো—
লের ছেলেবেলাতেও নিয়ে যেত। এখানের মেলায় তালপাতার
স বিখ্যাত। ব্যাগ, সাজি পাটি, আর ওই টুপি।

মেলার পর কিছুদিন ধরে গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলের মাথায়
হ্যাট দেখতে পাওয়া যাবে।

সাগর এসব শুনেছে মার কাছে।

সাগররা এর আগে কখনো আসেনি মার বাপের বাড়ির দেশে।

সাগরের ঠাকুর্দা নাকি কবে একবার বলে ফেলেছিলেন সাগরে' মাকে, বাচ্চা-টাচ্ছাদের না নিয়ে গেলেই ভাল হয়। পাড়াগাঁ, মশা: রাজত্ব, রোগ বাধিয়ে আনবে শেষটা। তোমার বাবার দেশের ম' তো বৌমা শুনেছি আস্ত মানুষটাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গি মাঠে ফেলতে পারে।'

সেই যে অভিমান হল মার, আর কক্ষনো বাপের বাড়ির দে' ছেলেদের নিয়ে গেলেন না। তখন বোধ হয় সাগরের দাদা প্রবা হচ্ছে 'বাচ্চা'। সাগর জন্মায়ইনি।

তা শুধু ঠাকুদ্দারই বা দোষ দেওয়া যায় কীকরে? সাগে বাবাই বা কবে এসেছে?

বাবারও নাকি দারুণ ভীতি ছিল পাড়াগাঁ সম্পর্কে। কিছুতে ই যেতে চাইতো না। মাকে পাঠিয়ে দিতো এর ওর সঙ্গে। মার কোন এক জ্ঞাতি দাদা থাকতো কলকাতায় মেসে, তারও মেলার সময় বাড়ি যাওয়া চাই-ই চাই। অতএব—

যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবে... সাগরদের বাড়িতে চলে আসতো ভোলামামা, ... রাতে, নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো, ... মাকে নিয়ে চলে যেতো। ভোরের গাড়িটা ই ...

তা গাড়ি যদি ছ'টায়, তো ভোলামামা জেগে উঠে বসে আছে র' চ তিনটেয়, আর থেকে থেকেই সাড়া তুলছে 'কইরে চিনু তোর হলো!'

ভোলামামাকে ছু চক্ষে দেখতে পারতো না সাগর।

প্রবাল বরং ভোলামামার তাসের ম্যাজিক দেখে মোহিত হতো ভোলামামার গল্প জমানোয় আকৃষ্ট হতো, সাগর কদাচ না। ও দেখলেই সাগরের মনে হতো লোকটা যেন ছদ্মবেশী দৈত্য, সাগরে মাকে ভুলিয়ে হরণ করে নিয়ে যাবার তালেই অমন একটা মজলি মানুষ সেজে আসে।

একদিন বলেও ফেলেছিল সেকথা মাকে। মা'তো শুনে হে খুন।

আবার সাগরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও ছাড়ে নি মা। সেই কথাটি হেসে হেসে বলে দিয়েছিল ভোলামামাকে।

গুঁফো ভোলামামারও গোঁফের ফাঁকে সে কী হাসি। সাগরের ইচ্ছে হয়েছিল ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির বাইরে পার করে দেয় ওকে।

এখন ভাবলে মন কেমন করে।

এখন বুঝতে পারে লোকটা সত্যিই ভালো লোক ছিল।

কয়েক বছর হলো মারা গেছে ভোলামামা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ। মেস থেকে কে একজন এসে খবর দিল বেশী জ্বর, সাগরের বাবা শুনেই চলে গেল। সাগরের মাকে বলে গেল, 'তেমন বুঝলে এখানে নিয়ে চলে আসবো। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

ওমা গিয়ে না কি দেখে সব শেষ।

সেদিনের বাবার কথাটা খুব মনে আছে সাগরের। বাড়ি ফিরে মাকে বললো, 'নিয়ে আসতে আর হলো না ভোলাদাকে।'

মা বললো, জ্বর ছেড়ে গেছে বুঝি?

বাবা বললো, 'হ্যাঁ! চিরদিনের জন্যে।'

মা আচমকা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সেই প্রথম বুকে ধাক্কা লেগেছিল সাগর নামের ছোট্ট ছেলেটার। সাগর যেন একটা অপরাধের ভার অনুভব করছিল।

সাগর তো তা বলে ভোলামামার 'চিরদিনের মত জ্বর ছাড়া চায়নি। সাগর শুধু ভোলামামার কলকাতা থেকে বদলি' হয়ে যাওয়া চাইতো। অনেক—অনেক দূর কোনো দেশে।'

ভোলামামা মারা যাওয়ার পর থেকেই সাগরের মার ফুলঝাটিতে যাওয়া বন্ধই হয়ে গেল। কে নিয়ে যাবে? মার নিজের তো ভাই নেই। দুজন দিদি আছে দূর-দূর দেশে, ওই ফুলঝাটিতে মায়ের শুধু মা ঠাকুমা আর দাদু।

দাদার পৈতের সময় মায়ের ওই ঠাকুমা আর ঠাকুরদাদাকে দেখেছে সাগর, এসেছিলেন ওঁরা। মায়ের মা আসতে চাননি।

বলেছিলেন, আমার সাধ-আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে। উৎসব বাড়িতে আমায় মানায় না।'

তখন সাগর বুঝতে পেরেছিল সাগরের দাদু নেই বলেই এরকম। একজন মরে গেলে আর একজনের সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যায়—এটা বুঝে সাগর খুব দুঃখ পেয়েছিল। সাগর তো জ্ঞানে তার দিদিমাকে দেখেনি।

কিন্তু সাগরের মায়ের দাদু-ঠাকুমা তো এলেন, আমোদ আহ্লাদও করলেন না, তা নয়। মার দেখাদেখি আমরা ওঁকে ঠাকুমা বলছিলাম বলে, ভুল শুধরে দিতে বললেন 'না, না। ঠাকুমা তো তোদের মায়ের। তোরা বলবি 'ঝি মা'।

শুনে তো আমরা ছি ছি করে উঠেছি।

'ঝি মা' কী আবার! ঝি তো বাসন মাজে।

মা বললো, 'পাড়াগাঁয়ে ওই রকমই বলে। যাকগে বাবা তোরা 'বুড়ো ঠাকুমা' বল'

ওঁরা দুজনে দাদাকে সোনার বোতাম আর পাথর বসানো আংটি দিলেন, আমাকেও একটা 'হাফগিনি' দিয়ে গেলেন। বললেন, তোমার ছোটছেলেটাকে তো দেখিই নি চিনু। মুখ-দেখানি দিলাম।'

তখন ভোলামামা ছিলেন, ওঁকে দিয়েই মা ফুলঝাটির সবাইকে আনিয়েছিলেন। ওই দাদু ঠাকুমা বাদেও পিসি জ্যেঠি কাদের সব যেন ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন ওই ভোলামামাকে দিয়ে। ভোলামামা নাকি বলতেন. 'আমার আবার ছুটি নেওয়া! হুঃ! চেয়ারের পিঠে চাদর বেঁধে রেখে চলে এসে, পাঁচ দিন ডুব মারতে পারি। অফিসের বঙ্কিমবাবু সব্বাইয়ের সই নকল করতে পারে। আর সইটা এমন রপ্ত করে রেখেছে যে দেখে আমিই বুঝতে পারি না। অফিসের হাজরে খাতার সইটা বঙ্কিমবাবুই ম্যানেজ করে ফেলে।'

বিয়ে-থাওয়া করেন নি ভোলামামা, স্ত্রী-পুত্র সংসার কিছুই নেই তবু এতো ছুটির দরকার কেন?...এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ভোলামামার

পরিচিত' জগতে যে যেখানে আছে, তাদের যতরকম 'কাজের দায়' এসে পড়ে, সব দায়ই তো ভোলামামার।

'ভোলাদা না থাকলে আমার এসব কিছুই হতো না—'

একথা মা দুঃখ করে এখনো বলে।

আর বলে, ভোলাদা গিয়ে অবধি ফুলঝাড়ির মামাদের সঙ্গে দেখা বন্ধ হয়ে গেল আমার

বাবাকে শুনিয়েই বলে, তবে বাবা এমন কোন ছেলে নয় যে, বলে ফেলবে, 'আচ্ছা, এবার না হয় আমিই যাচ্ছি—'

সাগরের এখনো পৈতে-টৈতে হয়নি।

প্রবালের এ বয়সে কবে হয়ে গেছে। ন বছরে না এগারো বছরে।

সাগর এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে, তবু ওর পৈতে নিয়ে কেউ গা করে না

চেষ্টা করে একটা উপলক্ষ খুঁজে বার করে ঘটাপটা করবার মন আর এখন নেই কারুর। যাঁর বেশী উৎসাহ থাকতে পারতো তিনিই তো পরপারে চলে গেছেন। ঠাকুর্দা।

সাগরের ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে অবশ্য খুব একটা ঘটাপটা হয়ে গিয়েছিল।

কেউ মারা গেলে বিয়েবাড়ির মত ঘটা করতে হয় কেন, এটা ভেবে পায়নি সাগর। সাগরের বড় দুঃখ হয়েছিল। দাদুকে সাগর খুব ভালবাসতো। ওই ঘটার পর অনেক সন্দেশ বেড়েছি , সাগরের সেজন্যে আরো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দাদু এতো ভালবাসতেন সন্দেশ খেতে। তা' রোজ মাত্র একটি করে খেতেন।

সাগরের মনে হচ্ছিল যদি একটুও উপায় থাকতো তাহলে বেশী করে চারটি সন্দেশ কাগজে মুড়ে দাদুর কাছে পেঁাছে দিতো।

বোধ হয় ওই ঘটাটা করতে হল বলেই সাগরের বাবা আর ছেলের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না।

মা একবার বলেছিল, 'হায়ার সেকেণ্ডারীটা দেবার পরই পৈতেটা

দিয়ে দিলে হয় সাগরের। কলেজে ঢুকতে ঢুকতে ন্যাড়া মাথায় চুল গজিয়ে যাবে।'

ওই পর্যন্তই।

তারপরই হঠাৎ এই ফুলঝাঁটি আসার কথা উঠলো। মা বললো, 'ছেলেরা বড় হয়েছে, ওদের সঙ্গে যেতে পারি না আমি? এখনো কি ওদের মশায় টেনে নিয়ে যাবে?'

প্রবালও তো এখন বসে।

কবে 'পার্ট-টু'র পরীক্ষা হবে, সেই অনিশ্চিতের আশায় হতাশ হয়ে বসে আছে।

'তৈরী পড়াগুলো ভুলেই যাচ্ছি—' বলেছিল প্রবাল, 'অথচ আর বইগুলো ছুঁতে ইচ্ছে করছে না। ভালই হবে মাব বাপের বাড়ির দেশের মশার কামড়ে সব ভুলে যাবো। ফিরে এসে নতুন করে পড়তে এনার্জি পাবো।'

দাদাই সাহস দিল।

সাগরের থেকে চার বছরের বড় দাদা প্রবাল।

ফুলঝাঁটিতে এসে মা কোথায় ভেসে গেলো। সাগর জানে না। দাদার খবরও প্রায় অজানা। সাগরকেই এই পুরানো বাড়ির দোতলায় ঘরে আটকে থাকতে হয়েছে।

রেলগাড়ি থেকে নামবার সময় সাগরের পা মচকে গেছে।

সাগর সকাল থেকে দুপুর অবধি জানালায় মুখ দিয়ে ওই লোকটাকে দেখে। ওই তালপাতার হ্যাট আর ভারী গামবুট-পরা লোকটাকে।

লোকটা নাকি একদা একজন আই সি এস অফিসার ছিল। মায়ের ওই জ্ঞাতি কাকা।

—ভাবা যায় না।

সত্যিই ভাবা যায় না, একজন আই সি এস ওই রকম হাস্যকর সাজে সেজে মাঠে কাজ করে বেড়াতে পারে। ...মায়ের মুখে তাঁর

এই কাকার কথা অনেক শুনেছে সাগর। সুবিধে পেলেই বাপের বাড়ির দিকের লোকের বিষয়ে গল্প করা মা'র এক বাতিক। ওঁর পিতৃকুলের যে যেখানে আছে, এবং ছিল, সবাইকে মা ওই গল্পের সূত্রেই চিনিয়ে ছেড়েছে।

সাগরের মনে হয় মায়ের কাছে যেন একটা ক্যামেরা আছে, মা সেইটা দিয়ে তার নিজের দিকের যে যেখানে ছিল আর আছে তাদের ফটো তুলে মনের অ্যালবামে সেঁটে রেখেছে।

সুবিধে পেলেই মা সেই অ্যালবামটা খুলে ধরে ছেলেদের দেখাতে বসে। তার মানে নিজেও তাদের সঙ্গে দেখতে বসে যায়।

তার সঙ্গে সুরু করে সেইসব কথা। যা বহুবার বলা হয়ে গেছে।

মায়ের দাদু যে অনায়াসেই দশ মাইল পথ হাঁটতে পারেন, এটা মা রোজ নতুন করে শোনাতে বসে।

প্রবাল তেমন কান পেতে শোনে না।

প্রবাল হেসে হেসে বলে, 'এ গল্প আর কতবার শুনবো মা?'

সাগর মাকে অমন মনঃক্ষুন্ন করতে পারে না।

সাগরের যেন মনে হয়, মায়ের কোনখানে একটা চাপা দুঃখ আছে। তাই সাগর মায়ের কথা গল্প সব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে।

মায়ের ওই আই সি এস কাকার গল্প শুনে শুনে মানুষটা সম্পর্কে মনের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য একখানা ছবি এঁকে রেখেছিল সাগর। বহুবারই তো শুনেছে, সেই বিরাট পোষ্ট, সেই অত টাকা মাইনে এক কথায় ছেড়ে দিলেন।...বললেন, 'মিথ্যের সঙ্গে আপোস করতে পারবো না।'

ছেলেদের কাছে বাপের বাড়ির লোকের বিষয় গল্প করার সময় সাগরের মা ছেলেদের বয়েস বা বোধশক্তির দিকে তত তাকান না, কথা উঠলেই (নিজেই ওঠায়) উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

ওই আই সি এস বি এন মুখার্জি সম্বন্ধেও সেই ভাবে বলেছে, কাকা তখন বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কড়া নীতি, দুঁদে মানুষ।

হঠাৎ ওর হাতে এক কেস এলো, মস্ত একটা দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারী ক
কাণ্ড। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার নিয়ে জাল জোচ্চুরী। কাক
তার মূল শেকড় টেনে তুলে দেখেন নাটের গুরু এক মন্ত্রি র
জামাই...

আর তার সহায়ক হচ্ছেন ওই মন্ত্রী-শ্বশুর।...স্বাধীনতার তখনো
খুব বেশি দিন হয়নি. শিশুরাষ্ট্র, শিশুরাষ্ট্র বলে সাতখুন মাপ চলছে
আর তখনো এখনকার মত পাবলিকের চোখে ধরা পড়েনি। যেই
রক্ষক সেই ভক্ষক। দুর্নীতি দেখে দেখে চোখে ঘাঁটাও পড়ে যায়
নি, কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু সোরগোল উঠলো।

কিন্তু ওই মন্ত্রিমশাই নাকি কাকার ওপর অনুরোধের চাপ
চাপালেন ব্যাপারটাকে চেপে ফেলতে হবে। মানে সব কিছুতে খাম
চাপা দিয়ে ভুলক্রমে এরকম একটা কেস উঠেছিল এটাই প্রকাশ
করতে হবে।

কাকা বললেন, 'অসম্ভব।'

ওরা বললো, 'তা বলে তো আর মন্ত্রীর জামাইকে কাঠগড়ায় দাঁড়
করানো যায় না? সেটাও অসম্ভব।'

কাকা বললেন, তাহলে যেটা সম্ভব সেটাই করতে হবে।'

ব্যাস্। অতো বড় পোষ্ট, অত টাকা মাইনে সব ছেড়ে দিয়ে চলে
এলেন ফুলঝাঁটিতে। বললেন, চাষবাস করবো।'

এই কথা বলে সাগরের মা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে গদগদ কণ্ঠে
বলতো, সেই যে তোদের পড়ার বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা...
আছে? 'আমিও দণ্ড ছাড়িনু, এবার, ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার
বিচারশালার খেলাঘরে আর না রহিব অবরুদ্ধ!'...ঠিক সেইরকম
না... মনে আছে তো শেষের লাইনগুলো, 'ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরব
পদ, দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ, গ্রামের কুটিরে চলি গেল ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।'...বিনুকাকার কথা ভাবলেই আমার ওই কবিতাটি
মনে পড়ে যায়—সরকারি পেন্সন পর্যন্ত নেন্ না জানিস্? অসময়ে
পদত্যাগ করলে সামান্য কিছুও পেন্সন দেয়, কারণ ওপরওলারা যে

ওকে বিবৃতি দিতেও দিল না, উনি পদত্যাগ করেছেন তাও ঠিকমত প্রকাশ করলো না। বললো, অসুস্থতার জন্যে ছাড়ছেন। কাজে কাজেই পেন্সন দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কাকা বললেন, ছেঁড়া জুতো পা থেকে ফেলে দেবার পর তার সুকতলাটা কুড়িয়ে তুলে নেব কাজে লাগবে বলে?'

মা আরো উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু সংসারের লোক এই তেজস্বিতার মর্ম বোঝে? বোঝে না। বিনুকাকী স্বামীর এই দুরকম মুখ্যুমিতে রেগে আগুন হয়ে কাকার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেলেন দুই ছেলেকে নিয়ে। ছেলেরা অবশ্যি তখন ছোট। কাকীর বাপ একজন বড় পুলিশ অফিসার। দাদাও ওই পুলিশেই ঢুকেছে। বিশ্ব সংসারের যত দুষ্কর্ম দুর্নীতির খবর ওদের ডালভাত। কাকী জানেন, এসব সাধারণ ঘটনা।...ক্ষমতা হাতে পেলেই লোকে নেবে সুযোগ, সে ক্ষমতা করবে প্রয়োগ। এটাই মানুষের স্বধর্ম। এই সব মানুষের সঙ্গেই আপোস করে সমাজে চলতে হবে। কারণ এরাই সমাজের মাথার মণি। তুমি ভাবলে আমি খুব একটা মহৎ ব্যক্তি, লোকে তা বলবে না। বলবে, গোঁয়ার মুখ্যু, কাণ্ড-জ্ঞানহীন। তোমার নিজের মহিমা বজায় রাখাটাই শেষ কথা? স্ত্রী পুত্রের প্রতি একটা কর্তব্য নেই?'...

তা কাকা বললেন, আমার স্ত্রী-পুত্র আমার মতই থাকুক। যখন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে মুখার্জি সাহেব হয়ে বেড়িয়েছি তখন তো স্বামীর সব কিছুর ভাগীদার হয়েছিলে? এখন যদি স্বামীর অবস্থার তারতম্য ঘটে থাকে, সেইভাবেই তো চলা উচিত। স্ত্রী শুধু ঐশ্বর্যের ভাগীদার? দৈন্যের নয়? সুখেরও সঙ্গিনী? দুঃখের নয়?"...তাতে, শুনলে তোরা অবাক হবি, কাকী দস্যু রত্নাকরের গল্প থেকে উদাহরণ তুলে বলেছিলেন, তাই হয়। স্ত্রী পুত্র মা-বাপ কেউই দুর্বুদ্ধির দুর্মতির ফলের ভাগ নেয় নি।'

তা নিলেন না তিনি সে ভাগ।

সেই অবধিই বাপের বাড়িতে।

ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, বড়টা তো মামা আর দাদুর পৃষ্ঠ পোষকতায় ইতিমধ্যেই ওই পুলিশে ঢুকে পড়ে বেশ ভাল চাকরী পেয়ে গেছে। আব কাকীকে পায় কে ?

সাগর অবাক হয়ে বলেছে,'আর ওদের কোনদিন ভাব হলো না ?'

মা হেসে ফেলে বলেছে, না। 'আর কোনদিন ভাব হলো না

সাগর তখন ক্লাশ এইটের ছাত্র।

সাগব মায়ের কোলের কাছে ঘেঁসে বলেছিল,'তুমি পারো মা ?'

শুনে মা অবাক্, কী পারি ?'

ওই রকম হঠাৎ বাবাব সঙ্গে ভাব ছেড়ে ফেলে চিরকালের মত অন্য জায়গায় থাকতে ?

মা বলেছিল, তুর্গা, তুর্গা। ও কী কথার দশা। একথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই বাবা। আমি কেন অমন হতে যাবো ?'

কাকা বেশ কয়েকবার বৌ ছেলেকে দেশে আসার কথা বলেছেন, কাকী বলেছেন, 'অ্যাবসার্ড।'

ছেলেরা বলেছে যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেখানে মানুষ বাস করতে পারে কী করে এ তো আমাদেব বুদ্ধির বাইরে। তাছাড়া, লেখাপড়া ? ইস্কুল কোথায় মানুষের মত ?

কাকা বলেছেন, 'ফুলঝাঁটির ইস্কুলে পড়েই আমি মানুষ হয়েছি

কাকা বলেছেন, 'মানুষ : তুমি অবশ্য তাই ভেবে আনন্দে আছো, সবাই ঠিক তা ভাবে না।'

কাকী তো আর সবাই ছাড়া নয় ? সাগরেব মার কাকী ? তাই সবাই যা ভাবে না, তিনিও তা ভাবেন না। সবাই যা ভাবে, তিনিও তাই ভাবেন।

এখন অবিশ্যি ফুলঝাঁটিতে ইলেকট্রিসিটি এসেছে, কারণ কাছেই কোথায় সব নানা কলকারখানা বসেছে। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে ? না সে আর কী করে তার বাড়িতে আসবে। তা গ্রামের লোক সবাই কি অতো খরচা করতে পারে ? তারা অপেক্ষা করে থাকে কাছাকাছি কোথায় কবে পোস্ট বসবে। তখন দেখা যাবে।

কাকা সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সবই মার ভোলাদার কাছ থেকে পাওয়া। ওই যে ওঁরা একসঙ্গে রেলগাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন, সেই সংসারদায় লেশ শূন্য সময়টার নিরবচ্ছিন্ন কথার চাষ চলতো। বেশীর ভাগই অবশ্য ভোলাদা বক্তা, চিনু শ্রোতা।

কখনো কখনো উল্টো।

'ভোলাদা চলে গিয়ে পর্যন্ত ফুলঝাঁটির খবরের দরজা আমার বন্ধ হয়ে গেছে'—চিনুর চোখ জলে ভরে আসে।

সাগর শুনলে ভাবে, সত্যি, ওই ফুলঝাঁটি আর তার লোকেরা মার প্রাণ!

যাক এতোদিন পরে মা আবার তার প্রাণের জায়গায় এসেছে।

সাগর ভাবে।

আর ভাবে ধোৎতারি, আসবার মুখেই পা মচকালাম। ওই বুড়োর সঙ্গে আলাপ করা হচ্ছে না।

মায়ের কাকা সম্পর্কে এত মহিমা এ যাবৎ শুনে এসেছিল সাগর যে, মনের মধ্যে তাঁকে বেশ একখানি হীরো করে রেখেছিল।

এসে যখন ওই মূর্তি দেখলো, সাগর যেন ধ্বসে পড়লো। 'লোকটা ছাড়া আর তো কিছু মনেই হচ্ছে না। ওকে 'দাছু' বলা যাবে?

অথচ মায়ের কাকাকে না কি দাছুই বলতে হয়।

মায়ের অতি শৈশবে বাবা গেছেন, নিজের কোনো কাকা নেই, ওই কাকার কাছে অনেক স্নেহ আদর পেয়েছেন—ওঁকে সমীহ না করলে চলবে?

পাটাকে ছ'ড়িয়ে বসে জানলায় মুখ রেখেছে সাগর, এরা কসে চুনে হলুদে লাগিয়ে দিয়েছে। তাই বিছানার চাদরটা বাঁচাতে পায়ের তলায় একখানা খবরের কাগজ খুলে বিছানো। সেটা হলুদের আর চুনের গুঁড়োয় বিচ্ছিরি হয়ে আছে। দেখলে অপ্রবৃত্তি আসছে।

সাগরের ভাগ্যেই এমন হলো।

যে কটা গল্পের বই সঙ্গে এনেছিল, এই তিন দিনেই দু-চারবার করে পড়া হয়ে গেছে। মায়ের মা সকালবেলা এসে কালী সিংহীর মহাভারতের একটিখণ্ড দিয়ে গেছেন, বলেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় লোক ভাত না জুটলে কচু ঘেঁচু যা পায় তাই দিয়েই পেট ভরায়, সেই ভেবেই পড়। তারপর দেখিস নেশা লেগে যাবে। গল্পের বইয়ের অভাবে উসখুস করছিস, দেখিস এর মধ্যে কত গল্প। এরপর অন্য খণ্ডগুলো চেয়ে চেয়ে পড়বি।'

দিদিমাকে এই প্রথম দেখলো সাগর।

ওর সম্পর্কে যা ধারণা গড়া ছিল, তার থেকে কিন্তু অনেক ভাল লাগলো। উনি যে এমন আঁট-সাঁট শক্ত পোক্ত তা ভাবতো না সাগর। সাগরের মা ওর থেকে ন্যাতা ন্যাতা। একটুতে হাঁপায়, একটুতে শুয়ে পড়ে।

দিদিমা খটখটে চৌকস।

চিনু তাঁর ছেলেদের কাছে মায়ের অনেক গুণের কথা বলেছে, রান্না-বান্না, সেলাই-টেলাই, বড়ি দেওয়া, আচার করা, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি, কিন্তু তিনি যে বইয়ের পোকা, তা কোনোদিন বলেনি। এখন বললো, মা তোমার এই পড়ার ঝোঁক যে দেখছি, বুড়ো হয়ে না কমে বরং বেড়েছে।...বুঝলি সাগর, মার এই বইপড়া বাতিকের জন্যে ঠাকুমার কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে হদ্দ হতো? ... তা তোদের মত অত গল্পের বই কোথায় পাবেন? ওই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপ-পুরাণ আর যত বাজের হোমিওপ্যাথির বই।

সাগরের দাদু নাকি হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিলেন, এবং ভাল করে শেখবার খুব ঝোঁক ছিল।

সাগরের মা নিজের ছেলের গল্পের বইয়ের অভাবে ছটফটানির কথা তুলেই ওকথা বলেছিল।

দিদিমা বললেন, 'বুড়ো হয়ে কমবে কেন বাড়াই তো উচিত ক্রমশঃই তো চোখের জ্যোতি কমে আসছে, যতদিন পারি পড়ে নিই

তারপর ওই মহাভারত প্রদান।

সাগর দেখলো বেশ ভাল করে বাঁধানো খণ্ডর পিছনে নাম লেখা শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।

দিদিমার নাম যে মৃন্ময়ী দেবী, তা যেন প্রথম জানলো সাগর। আগে যদি শুনেও থাকে মনে নেই।

তবে মৃন্ময়ী দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে' বলে মনে হচ্ছে না, কী জটিল ভাষারে বাবা! আর কে কার ছেলে আর কে কার বাবা, বুঝতেই মাথা ঝিমঝিম করে। শুয়ে শুয়ে পড়ার পক্ষে ভারীও আছে।

তার থেকে মন্দর ভালো জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা

সাগরের দিদিমাদের জমির অংশের লাগোয়াই হচ্ছে ওই লোকটার জমি। মা যাকে বলতে বলেছে 'সাহেব দাদু'। এখানের সব নাতি-নাতনী সম্পর্কিত ছেলেমেয়েরা নাকি ওঁকে সাহেব দাদুই বলে

তার কারণ বোধ হয় ওই তালপাতার হ্যাট।

অথবা প্রাক্তন জীবনে উনি যখন এই ফুলঝাটিতে আসতেন, তখন ওঁর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ পোষাক আসাক চলন-বলন এবং ওঁর স্ত্রী-র জ্বলজ্বলাটি ভাবই এই নামের জনক।

বিন্দুবাকী নাকি তখন এক দু-দিনের জন্যে আসতেন, সঙ্গে -চাকর আছালি নিয়ে। সমারোহ দেখিয়ে চলে যেতেন।

ওঁর লোকজন ওঁকে 'মেমসাহেব' বলতো, সেই থেকেই হয়তো নামকরণ। মোটকথা একদার বি এন মুখার্জি এখন ছেলে-মেলে সাহেবদাদু নামেই পরিচিত।

পাটাকে একটু ছুঁড়লো সাগর।

অসহ্য এই আটকে থাকা।

ছুঁড়ে নিজেরই লাগলো।

বলে উঠলো, 'উঃ।'

আর হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো 'টু।'

মেয়ে-গলা।

সাগর চমকে তাকালো।

সেই মেয়েটা। যে সাগরদের আসার দিনই 'অভ্যর্থনা' সমিতির' চেয়ারম্যান হয়ে হৈ-চৈ করে মরছিল! কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে কিনা, ও চিনুপিসি, তোমার ছেলে কার বাড়িতে হাঁড়ি খেতে গিয়েছিল?'

হাড় জ্বলে গিয়েছিল সাগরের।

অন্য লোকের বাড়ির লোককে যে 'আপনি' করে বলতে হয়, এটুকু জ্ঞানও নেই। তার জীবনে যাকে দেখিস নি, তার ব্যাপারে এইভাবে কথা বলা!

তা সেই যা দেখেছিল সেদিন, তারপর আর দেখেনি সাগর মেয়েটাকে, ভেবেছিল, বাঁচা গেছে। বোধ হয় অন্য কোথাও থেকে আসা মেয়ে। চলে গেছে নিজের জায়গায়।

আবার এলো হাড় জ্বালাতে!

সাগর শক্ত হয়ে বসে মহাভারতখানা পাশ থেকে তুলে নিয়ে খুলে ধরলো।

'ব্যস!

ওর মতো মেয়ের পক্ষে যেমন আচরণ সম্ভব, তাই করলো মেয়েটা, হি হি করে গড়াতে গড়াতে এসে ধুপ করে খাটের উপর এসে পড়লো।

সাগর তো আর কথা কইতে যাবে না, কাজেই বিরক্তি প্রকাশ চলে না। সাগর মন দিয়ে 'বৈশ-ম্পায়ন' কী কহিলেন তাই দেখতে লাগলো।

মেয়েটা বলে উঠলো, আহা! কী বই নিয়েই বসেছেন। যেন পাকাবুড়ো। এইটুকু বয়সে আবার ওই বুড়ো' মহাভারত পড়া কেন রে? পড়বি তো ছোটদের মহাভারত পড়—'

সাগর কি এরপরও চুপ করে থাকতে পারবে?

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, তুমি আমায় 'তুই তুই করছো মানে ?'

মেয়েটা কিছু না দমে হেসে হেসে বলে, মানে হচ্ছে আমি তোর দিদি। সাল তারিখের হিসেব করে প্রমাণ হয়ে গেছে তুই আমার থেকে আট মাসের ছোট। অতএব তুই আমায় দিদি বলবি। 'লতুদি'। বুঝলি ? আমার নাম হচ্ছে শ্রীমতী লতিকা সরকার।

তোমার নাম জানতে আমার দরকার নেই। সাগর আবার মহাভারতের পাতায় মনোনিবেশ করে।

লতিকা বলে ওঠে, 'কলিকালে কারুর ভাল করতে নেই। ভাবলাম আহা ছেলেটা পা মচকে একা পড়ে আছে, যাই একটু গল্প-সল্প করিগে ! তা এমন ভাব করছিস, যেন শত্রু এসেছি। আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোকেরা বাবা, আপনজনকে তুই তুমিই বলি, অত আপনি আজ্ঞে করি না। যাক এবার থেকে 'আপনি' করেই বলবো।...এই একটা ডাঁসা পেয়ারা এনেছিলাম, খাবেন তো খান। আর যদি ইচ্ছে না হয় জানলা দিয়ে ফেলে দিন।

বলে খাট থেকে নেমে পড়ে।

দুখানা পাতা সমেত নাঁটোল পুষ্ট একটি পেয়ারা। সদ্য গাছ ভাঙ্গা। দেখে লোভ সামলানো শক্ত।

সাগরের হঠাৎ মনে হয়, ওই লতিকার মুখটা যেন এই পেয়ারাটার মত। নীটোল চকচকে আর তাজা।

চলে যাচ্ছে দেখে একটু লজ্জা হলো।

ব্যবহারটা ভালো হয়নি।

সত্যি গ্রামের লোকেরা তো গাঁইয়া হবেই।

ইতস্ততঃ করে বললো সাগর, 'চলে যেতে কে বলেছে ?'

'থাকতেও কেউ বলেনি।'

'বলার কি আছে ? তুমি তো বসতেই এসেছিলে—'

লতিকা বলে, 'এসেছিলাম, কিন্তু আপনি তো শত্রুর মত দেখলেন।'

'আঃ। আপনি কী আবার ?'

'তা কী করবো ? আমি বাবা হয় তুই বলবো, নয় 'আপান' মাঝামাঝির মধ্যে নেই ।'

'ঠিক আছে, তুই-ই বল বাবা ।'

'বাঁচলাম । ইচ্ছে করলে তুইও আমায় তুই বলতে পারিস । আমি তো আমার দিদিকে তুই বলি ।'

'সে তো আমিও আমার দাদাকে বলি ।'

'তবে' ?'

লতিকা বলে ওঠে,'তবে তো ল্যাঠা মিটেই গেল । খা পেয়ারাটা ।

'তোমার কই ?'

'এই আবার তুমি ?'

সাগর অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বলবো পরে । এতো তাড়াতাড়ি—

'আচ্ছা তু'দিন সময় দিলাম । কিন্তু খবরদার নাম ধরবি না । লতুদি বলবি । আমার কী পেয়ারার অভাব ? এই দেখ কত রয়েছে ।

আঁচলের তলা থেকে চার চারটে ভাল ভাল পেয়ারা বার করলো ।

বললো 'ওই একটা দেখেই চিনুপিসি বললো, 'অতবড় পেয়ারাটা আস্ত খেলে সাগরের পেটব্যথা করবে, দে কেটে দিই ।' আমি দিলাম না । পাতাশুদ্ধু কা সুন্দর দেখতে । তুটো তোর দাদাকে দেব । অবশ্য আমারও দাদা । কোথায় রে সে ?

সাগর মাথা নাড়লো, 'আমি কি জানি ?'

'তবে তোর কাছে রেখে দে । এলে দিস । চিনু পিসিকে দিলে ঠিক কেটে টুকরো করবে । পেয়ারা কেটে খেলে স্বাদ থাকে ? ছিঃ ।

সাগর জিনিসটার স্বাদ পেতে পেতে বলে, 'তা সত্যি ।'

লতুও একটা হাতে নিয়ে দাঁত বসাতে বসাতে বলে, 'তোর দাদা, মানে প্রবালদা, কী পড়ে রে ?'

'এই তো পার্ট-টু দেবে । কবেই দেওয়া হতো গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে পড়তো । পরীক্ষা পিছিয়ে পিছিয়ে এতো দিন যাচ্ছে ।'

দাদাকেও যেন নেহাৎ হেলা ফেলা করে কথা না বলে মেয়েটা, তাই সাগর এতো গুছিয়ে কথা বলে দাদার সম্পর্কে।

লতু পেয়ারা চিবোতে চিবোতে ঘরের এদিক ওদিক দেখে বলে, এই ঘরেই বুঝি তোরা থাকিস ?'

'আমি মা আর দিদিমা।'

'আর প্রবালদা ?'

পাশের ঘরে। অনেক তো ঘর আছে। বুড়ো ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না বলে নীচতলায় থাকেন !'

লতু একটা পেয়ারা শেষ করে আর একটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে কর্তাদাছু কিন্তু খুব শক্ত আছেন, এই তো আশী বছর পার হয়ে গেছে, রথ যাত্রা দেখতে পুরী গেছেন।

খবরটা সাগরের জানা।

সাগরের মা আঙুল গুনে গুনে দেখছেন কবে ফিরবেন তিনি।

লতু আবার বলে ওঠে 'সাহেব দাছুকে দেখলি ?'

সব সময়ই তো দেখছি।

সাগর বাইরের দিকে তাকায়।

লতু হঠাৎ ওর মাথায় কটা টোকা মেরে বলে 'তুই একটা বুদ্ধু। ওই দেখার কথা বলেছি···আলাপ করার কথা হচ্ছে।'

সাগর উদাসভাবে বলে, 'আমি আর কী করে আলাপ করতে যাবো ?'

হ্যাঁ তাও তো বটে। লতু আবার হি হি করে হাসে, ওই তো ঠ্যাং ভেঙে বসে আছিস, তা দাছু আসেন নি তোদের দেখতে ?'

শুনলাম এসেছিলেন কাল। নীচের তলায় বসে কথা টথা বলে চলে গেছেন।

উত্তর না দিয়ে উপায় নেই, তাই দেওয়া।

নইলে আবার 'হি হি' আর 'ঠ্যাং ভাঙা শুনে সাগরের মেজাজ তো গরম হয়ে উঠেছে।

'ওমা তুই এখানে পড়ে আছিস, বুড়ো তোকে একবার দেখেও

গেল না? লতু গিন্নীদের মত গালে হাত দিয়ে বলে 'বুড়ো এক আজব জীব।...শুনেছিস কিছু এর বিষয়ে?

সাগর গম্ভীরভাবে বাইরে চোখ ফেলে রেখেই বলে 'সবই শুনেছি।'

'তা তো শুনবিই। চিন্নুমাসি তো বলবেই। বোঝ কী রকম অদ্ভুত মানুষ। কোথায় রাজার মত থাকবার কথা, তা নয়, ওই দীন দুঃখী চাষীর মতন। পরের হাততোলায় খাওয়া দাওয়া।'

সাগর 'হাততোলা' শব্দটার মানে জানে না। তাই বলে, 'কিসে খাওয়া-দাওয়া?'

'আহা বুঝতে পারলি না? সাহেব দাদুর নিজের বাড়িতে তো আর রান্না-টান্নার ব্যবস্থা নেই? কে করবে? বাড়িতে না আছে কোনো মেয়েমানুষ না আছে রাঁধুনী-চাকর।...কে করবে ব্যবস্থা? পটাই দিদা যাই রেঁধে বেড়ে দু বেলা খাইয়ে যায় তাই—'

'মেয়েটা তো কথাও বলতে পারে।'

মনে ভাবে সাগর।

পটাই দিদা! আবার কেমন নাম?

সে আবার কে।

তাছাড়া—ওই সাহেব দাদুর জন্যে কে রান্না করে দেয়, তা জেনে সাগরের লাভ?

সাগর কথা বলে না।

লতু দ্বিতীয় পেয়ারাটা শেষ করে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'তুই দেখেছিস পটাই দিদাকে?'

'নামও শুনি নি।'

'ওমা! আসল লোকেরই নাম শুনিস নি?' লতু একটু হাসে।

'আসল লোক মানে? কে হন উনি?'

'কে হন? মানে চিন্নুপিসির এক-রকম পিসি আর কি। 'লতু হঠাৎ মুখটাকে দিব্য শান্ত করে নিলো, কেন কে জানে। বললো সাহেব দাদুরও সেইরকম বোন হলেন। খুব মজার মানুষ। সব সময়

হাসছেন। কথায় কথায় ছড়া আওড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে আবার গানও গান। কের্তনের গান। পাড়ার সবাইয়ের উপকার করে বেড়ান।'

সাগরের এসব কথা মোটেই ভাল লাগছিল না, কোথাকার কে তার ঠিক নেই তার কথা শুনে কী হবে সাগরের!

লতু ঘরের মধ্যে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল, আর বসেনি।

এখন বলে উঠলো, গল্প করতে তোর ভাল লাগছে না বুঝতে পারছি। চললাম। কলকাতা থেকে এসেছিস বলেই আহ্লাদ হলো। কলকাতার লোক দেখতে খুব ভাল লাগে রে—

সাগরের মনটা মায়া মায়া হয়।

সত্যি তার ব্যবহারটা ভাল হচ্ছে না।

বলে উঠলো, 'আমি তো বলিনি ভাল লাগছে না।'

'তুই বলিস নি, তোর চোখ-মুখ বলছে। আচ্ছা চললাম। পেয়ারা দুটো প্রবালদাকে দিস।'

আর সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে যায় সাগরের।

আশ্চর্য এতোক্ষণ তো কেবলই মনে হচ্ছিল কখন যাবে ও। কথা বলে বলে মাথা ধরিয়ে দিল। কিন্তু চলে যাবার সময়টা এমনভাবে চলে গেল।

মায়া মায়া লাগছে।

আহা সত্যি, গ্রামে পড়ে থাকে, কলকাতার লোক দেখলে ভাল লাগে। তা আগে বলবি তো একথা। তাহলে সাগর একটু ভাল ব্যবহার করতো!

সাগরের ধারণা ছিল গ্রামের মেয়েরা খুব শান্তশিষ্ট সভ্য সংযত হয়, তাই সাগরের লতুকে দেখে বাচাল মনে হচ্ছিল। এখন মনে হয় কী আর বাচালতা করেছে! বেশী কথা কইতে ভালবাসে তাই।

সাগর মনে মনে ঠিক করে ফেললো, এরপর দেখা হলে একটু ভদ্র ব্যবহার করবে। গল্পে উৎসাহ দেখাবে।

কিন্তু কি হয় ও এদের।

আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কী।

সম্পর্ক যে কিছুই নেই, থাকতে পারে না সেটা বোঝবার ক্ষমতা সাগরের থাকবার কথা নয়। সাগরের বয়সী কোনো মেয়ে ঠিকই বুঝতে পারতো। লতুর কথা শুনেই বুঝতে পারতো। মুখুয্যে চাটুয্যেদের সঙ্গে সরকারদের যে সম্পর্কের যোগসূত্র থাকে না সেকথা মেয়েরা জানে।

এটাও একটা আশ্চর্য !

একটা পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুটো ছেলে আর মেয়ের মধ্যে 'সংসারজ্ঞানের' পার্থক্য থাকে আকাশ পাতাল। মেয়েরা যে কোন ফাঁকে সব কিছু বুঝে ফেলে জেনে ফেলে, শিখে ফেলে ! ছেলেগুলোব ওই 'বোধের' জগতেব দবজাটি স্রেফ বন্ধ।

বিশেষ করে এই একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেগুলো যেন এইমাত্র পৃথিবীতে পড়লো, যা শোনে তাতেই অবাক হয়। আর মেয়েগুলো যেন কিছুতেই অবাক হতে জানে না, সব জেনে বুঝে ওস্তাদ হয়ে বসে আছে।

যে পরিস্থিতিতে মেয়েগুলো ধুরন্ধর সেই পরিস্থিতিতে ছেলে-গুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাগরেব ভেবে অবাক লাগলো লতু সাগবেব থেকে মোটে আট মাসেব বড।…ওর মুখ-চোখ কাথাবর্তা ভাবভঙ্গী সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন সাগরেব মা দিদিমাদেবই দলেব এক-র্ন।

লতু একটা আস্ত বড মেয়ে। সাগব স্রেফ একটা 'ছেলে' মাত্র

সাগবে- এখন লতুর ওপব খুব বাগ এলো। যেন লতুই সাগরকে 'ছোট' কবে রেখে ডিঙিয়ে বড় হয়ে গেছে।

তখন সাগব শক্ত হলো।

দিদি বলবে না হাতী করবে।

লতুদি !

দায় পডেছে বলতে।

লতু! স্রেফ লতু। আর হ্যাঁ ওই, 'তুই'ই ঠিক। ও যদি অমন অনায়াসে সাগরকে 'তুই' বলতে পারে, সাগরই বা নয় কেন?

দাদা এসে ঘামে ভেজা জামাটা খুলে খাটের বাজুতে বিছিয়ে ফিরলে, সাগর পেয়ারা দুটো বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এই নে।'

প্রবাল তাকিয়ে দেখে হো হো করে হেসে বলে উঠলো, 'তুই আমায় দিতে এসেছিস? এই নে কটা খাবি।'

প্রবাল তার প্যাণ্টের দু পকেট থেকে তেমনি তাজা ডাঁশা পেয়ারা বার করে সাগরের বিছানার ধারে রাখে।

এখন সাগরের নজরে পড়ে, দাদার পকেট দুটো ঢিপি হয়ে রয়েছে।

সাগব হাসি হাসি মুখে বললো, 'কোথায় পেলি।'

'কোথায় না পাবো? চারিদিকেই তো পেয়ারা গাছ। আর গাদা গাদা ফলে রয়েছে।'

'কী অদ্ভুত! কেউ নেয় না।'

'কত নেবে? এখানের ছেলেমেয়েদের কাছে তো আর এটা নতুন নয়। অরুচি ধরে গেছে। তোরই পায়ের জন্যে মুস্কিল হয়ে গেছে।'

ছেলেরা কখনো 'মন কেমন' প্রকাশ করে 'আহা' বলে না, এই-টুকুই যথেষ্ট। সাগবের মনের মধ্যে সুখ দুঃখের একটা আলোড়ন ওঠে।

দাদা জামা গেঞ্জি খুলে রেখে আর একটা গেঞ্জি খুঁজছিল আলনা উটকে। এই ঘরে মা, এই ঘরেই আলনা বাক্স। সাগর বললো, 'লতিকা সরকার তোর জন্যে এই দুটো রেখে গেছে। ওদের গাছের।'

লতিকা সরকার।

প্রবাল বললো, 'তিনি আবার কে?'

সেই যে সেই মেয়েটা! আমাদের আসার দিন তুই যার হৈ-চৈ দেখে বললি 'ইনিই বুঝি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ার-ম্যান।'

'ও ! সেই মেয়েটা ! মা যাকে লতু লতু করছিল ? তিনি আবার লতিকা সরকার হলেন কখন ?

'আমায় তো বললো, ওই নাম ওর।'

দাদা বললো, 'মেয়েটা ভারী বক্তার। সেদিন এতো বকবক করছিল ! তোকে জ্বালাতে এসেছিল বুঝি ?'

সাগর হেসে ফেলে বললো, ঠিক ধরেছিস।

লতিকা প্রসঙ্গে যবনিকা পাত করে প্রবাল বললো ওই ভদ্র-লোকের সঙ্গে আজ খুব কথা হলো ! ভেরি ইন্টারেস্টিং। এতো আইডিয়া আছে ওঁর মাথায় !'

'কে ওই সাহেব দাদু ?'

হুঁ ! সবাই তাই বলে শুনলাম। উনি অবশ্য খুব হেসে হেসে বললেন, 'সাহেবের কোন চিহ্নটা দেখলে আমার মধ্যে ? এই তালপাতার টুপিটা ? না ছেঁড়া বুটজোড়াটা ?…ভদ্রলোকের কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে।'

'আই সি এস অফিসার ছিলেন তো ?'

সে তো ছিলেন। তাছাড়াও অনেক কিছু নিজে স্টাডি করেছেন উনি। শুনলে অবাক হবি উনি মৌমাছি পালন শিখে মৌচাক বানিয়ে একবার নাকি দু সের মধু তৈরী করেছিলেন।

সাগরের মনে হলো, দাদা ওঁকে দেখে বেশ মোহিত হয়ে গেছে।

আঃ, সাগরের পা'টা যে কবে সারবে !

ধড়াচুড়ো ছেড়ে ঘসে ঘসে তেল মাখছিলেন বি এন মুখার্জি, এরপর গিয়ে পুকুরে পড়বেন।

হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলেন মুখার্জি।

'আরে চিনু আয় আয়। এইটিই বুঝি তোর ছোটছেলে ? পা সেরেছে ?'

চিনু একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁ। সেই দিন থেকে ছটফট করছি তোমার কাছে একবার নিয়ে আসবো—'

মার ওই তুমি কথাটাও সাগরের কানে খট করে বাজলো।

সাগরের তো কাকা জ্যাঠা মেশোমশাই পিসেমশাই সবাইকেই আপনি বলে। তার মানে এই ফুলঝাঁটিতে সবাই সবাইয়ের খুব আপনজন।

সাগর ছেলেবেলা থেকেই জানে বড়দের নতুন দেখলেই প্রণাম করতে হয়। মায়ের নির্দেশে করেওছে। কিন্তু হঠাৎ যেন ওই ব্যাপারটায় দারুণ লজ্জা পাচ্ছে।...গুরুজন দেখলাম, আর ঢিপ করে মাথা হেঁট করলাম, এটা যেন নেহাৎ ছেলেমানুষী।

অথচ না করলেও অস্বস্তি লাগে।

করি কি না করি এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা নিয়ে বেশীর ভাগ সময় খাড়া দাঁড়িয়েই থেকে যায়।

হঠাৎ লম্বা হয়ে গিয়েই কি এমন অবস্থা হয়েছে? না কি সাগরের বয়সের সব ছেলেরই এই দশা ঘটে?

এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়বার ভয়েই সাগর লম্বা হয়ে পর্যন্ত সাধ্যপক্ষে বাড়িতে কেউ এলে তার দিকে যেতে চায় না। আর জানে তো, মা হয় প্রণাম করতে ইসারা করবেন নয়তো খোলা গলায় বলে উঠবেন, 'ও কী রে ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে প্রণাম কর।'

এতো রাগ হয় তখন।

আজ আর সাগর ওই সব বলাবলির মধ্যে যাবে না ঠিক করেই এগিয়ে গিয়ে প্যান্টের কোমরটা টেনে টাইট করে হেঁট হতে গেল, আর আজই কিনা মা বলে উঠলো 'এই এই তেল মাখছেন, এখন প্রণাম করতে নেই।'

যা বাবা!

উনি বললেন, 'তেল মাখার সময় প্রণাম করলে কী হয় রে?'

মা বললো 'পরমায়ু ক্ষয় হয়।'

শুনে ওনার কী হাসি!

হা হা করে একেবারে।

এই লোককে ওঁর স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করেছে। ভেবে ভারী আশ্চর্য লাগলো সাগরের।

'আমি হচ্ছি তোমাদের সাহেব দাদু বুঝলে ? কী রকম লাগছে ? ঠিক সাহেবের মতন ?'

আবার হাসি।

তারপর নানান জিজ্ঞাসাবাদ।

কী পড় ? কী নিয়ে পড়ছো। পাশ করে বেরিয়ে—কী পড়ার ইচ্ছে ! এই সব।

মা বললো, পাশ করুকই আগে।

সাহেব দাদু ধমকে উঠে বললেন, 'তুই থামতো। ভদ্রলোকের ছেলে, পাশ করবে না কি ? কেন তোর বড়ছেলেটাকে তো খুব ইন্টালিজেন্ট দেখলাম।'

মা অমনি বলে বসলো, 'বড়টির মত এ নয়। একটু ভাবুক ভাবুক।'

আঃ ! এতো বাজে লাগে এই রকম কথা।

নিজের সম্পর্কে কোন কথা উত্থাপিত হওয়াই পছন্দ করে না সাগর। তবে উনি এতে একটি বেশ ভাল কথা বললেন। বললেন, 'তাই না কি ? তাহলে বিকেলের দিকে আমার কাছে চলে আসবে বুঝলে ? আমি তোমায় এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো। ভাববার খোরাক পাবে।'

ওরা যখন চলে আসবে তখন টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে এক মহিলা প্রবেশ করলেন।

ছিপছিপে গড়ন ধবধবে রং, আব টিকটিকে মুখ এই বিধবা মহিলাটিকে এর আগে দেখেনি সাগর।

ইনিই বোধহয় তিনি।

লতুটা যার কথা বলছিল।

কী যেন দিদা।

কী সেটা মনে পড়ছিল না, মার বলে ওঠায় মনে পড়ে গেল।

মা বললো 'আরে পটাই পিসি। যাক তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।'

সাহেব দাদু বলে উঠলেন, 'এই ভয়ই করছিলাম।'

'কী ভয় শুনি ?'

পটাইয়ের মুখটা কৌতুকে ঝলসে উঠলো।

'এই যে ! পটেশ্বরী দেবী কৌটো হাতে ঝুলিয়ে হাজির হলেন বলে। আমার এদিকে চান হয়নি।'

পটাইয়ের রাজসংস্করণ 'পটেশ্বরী' তা বোঝা গেল।

পটেশ্বরী অথবা 'পটাই হাতের কৌটো নামিয়ে ওদিকে কোথায় যেন গিয়ে হাত ধুয়ে এসে 'আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, কবে আবার আমি এসে দেখি বিনুদা তোমার চা হয়ে গেছে ?

'আহা অত অপবাদ দিসনি, কতোদিন—'

বাজে কথা বিশ্বাস করিসনি চিনু। রোজ এই বেলা দেড়টা দুটোয় চান। তাবপর খাওয়া। বেলা বারোটায় ভাত চড়িয়েও সে ভাত ঠাণ্ডা ! এতে শরীর টেঁকে ?

বিনুদা প্রায় যুবকদের মত গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে নিজের দু বাহুতে থাবড়া মেরে বললেন, কেন ? দেখে কি না টেঁকার মত লাগছে ? কী রে চিনু ?'

চিনু বললো, থাক আর মঙ্গলবারের ভরদুপুরে নিজেকে খুঁড়তে হবে না।

'এই দ্যাখ পটাই চিনু তোর মতন কথা বলছে।'

আবার সেই হাসি।

পটেশ্বরী ফর্সা থানের আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলেন, বলি কি আর সাধে ? জানো না—কথায় আছে কোরো না ভাই কিচ্ছু নিঁয়ে জুরিজারি—

'নারায়ণের আসল নাম দর্পহারী।'

'এই হলো আরম্ভ তোর তত্ত্বকথা।'

চিনু বলে, 'যাও যাও তুমি নাইতে যাও। আমি বরং ততক্ষণ পটাই পিসির সঙ্গে গল্প করি।'

'কর!' বিনুদা বলেন, আজ যখন ওর ভাগ্যে তুই রয়েছিস। নইলে রোজই তো ভাত নিয়ে এসে বসে বসে ঢোলে। আমি তো ওকে দেখে তবে ভয়ে ভয়ে নাইতে ছুটি।'

'আহা! আমার ভয়ে তো পিঁপড়ের গর্তয় ঢোকো তুমি।' পটেশ্বরী মুখে একটি আহ্লাদের ভঙ্গী করে বলেন, শুনিস কেন চিনু বিনুদার কথা দুবেলা ছুটো, খেয়ে আমায় উদ্ধার করেন এই পর্যন্ত। অনিয়মের চূড়ান্ত করেন।'

সাহেব দাদু হাসতে হাসতে চান করতে চলে যান। দুই মহিলা গল্পে মসগুলে হয়ে যান।

সাগরের হঠাৎ যেন নিজেকে অবান্তর মনে হয়। চলে যেতে ইচ্ছে করে। ওই পটেশ্বরীটি তো তাকিয়েও দেখলেন না, এখানে আর একটা মানুষ আছে।

'আমি যাই।'

বললো সাগর।

মা বললো, 'ওমা তুই আবার এই রোদে একা যাবি কেন? আমি তো এই যাচ্ছি।'

'তুমি গেলে রোদ কমবে?'

'তা' না হয় না হলো? তোর কি এখানে কাঁটা ফুটছে?'

এতক্ষনে পটাই একটি কথা বললেন সাগর সম্বন্ধে। হেসে বললেন, 'তা ফুটছে বাপু। এই বয়সের ছেলেকে মেয়েলি গল্পের মধ্যে মধ্যে বসে থাকতে হলে কাঁটাই ফোটে। ওর পা সেরেছে?

সাগরের আবার রাগ ধরে গেল।

তার পা মচকানোর খবরটা কি দেশশুদ্ধ লোককে জানানো হয়েছে। সেরেছে সেটার প্রমাণ দেখাতে সাগর 'আমি যাচ্ছি—বলে হনহন করে বেরিয়ে পড়লো।

গাঁটের কাছে খচখচ করছে! করুক।

সাগর জানতো না লতিকাদের বাড়িটা কোন দিকে। সাগর তার দাছুর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল পাশ থেকে লতিকার গলা শোনা গেল। ওমা তুই-এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিস ?'

তাকিয়ে দেখে একটা একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপরকার ঘরের জানলায় লতুর মুখ।

আবার এই এক ঝামেলা।

সাগর বললো, 'বাড়ি যাচ্ছি।'

'গেছলি কোথায় ?'

'সাহেব দাছুর ওখানে—

সাগর চলতে শুরু করে। রোদ সত্যিই বেশী।

চলতে চলতেই সাগর টের পায় লতিকা সরকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে তার পিছু নিয়েছে। কী ছিনে জোঁক মেয়ে বাবা !

'এই অতো জোরে হাঁটছিস কেন ?'

লতিকা ওকে ধরে ফেলতে না পেরে ডাক দেয়, 'দেখছিস আমি এলাম !'

সাগর ঠিক করেছিল সেও ওকে তুই বলবে, কিন্তু চট করে পেরে উঠল না। আলতোভাবে বললো, কে বলেছে আসতে ?

'বাবা বাবা, তুই যে কী অভদ্র ? ভাবতাম কলকাতার ছেলেরা খুব ভদ্র সভ্য হয়। তুই বাবা যেন কাঠখোট্টা।'

সাগর এরকম কথা পছন্দ করে না, তবু বলবেই লতুটা। এই তো কাল গিয়ে সাগরের দিদিমার সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে বক বক করলো তার বেশীর ভাগই সাগরের আর প্রবালের নামে ব্যাখ্যানা।

বুঝলেন চাটুয্যে দিদা, আপনার এই নাতি ছুটি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না।'

এই একজনকেই 'আপনি' বলতে শোনে সাগর লতুর মুখ থেকে।

দিদিমার সামনে সকলেই যেন সমীহ করে কথা বলে।

দিদিমার থেকে বয়স্ক লোকেরাও।

এমন কি স্বয়ং শাশুড়ী, যিনি না কি একদা মৃন্ময়ী দেবীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তিনিও যা বলেন, আড়ালে বলেন।

ঘরের মধ্যে গজগজ করতে থাকেন, আর যদি মৃন্ময়ী দেবী হঠাৎ জিগ্যেস করেন, মা কিছু বলেছেন ?'

উনি চট করে বলে ওঠেন, না বাছা তোমায় কিছু বলিনি। বলছি আপনার কপালকে। ভগবান যার এক সন্তানকে কেড়ে নেন তার আর—'

'সে তো অনেকদিনের কথা মা। ভগবান এতোদিনে ভুলেও গেছেন।'

ভুলে গেছেন!

শাশুড়ী রেগে রেগে চাপা গলায় গর্জন করেন। সব 'তাতেই আমার সঙ্গে টক্কর।'

তবু সামনে কিছু বলতে পারেন না।

মৃন্ময়ীর যে অবসর সময়টা বড়ি দিতে, আচার-আমসত্ত্ব বানাতে, নিদেন চালেব কাঁকর বাছতে ইচ্ছে না করে বই পড়তে ইচ্ছে করে, এতে তিনি ক্রুদ্ধ, কোপটা নিজের মধ্যে সংহত রাখতে হয় বলে, আরো ক্রুদ্ধ।

শ্বশুরও বৌমাকে সমীহ করে চলেন, বলেন।

ওই যে সাগরের মার আর এক কাকা, ছোটকাকা : যদিও জ্ঞাতি কাকাই, তিনিই তো এ সংসারের সব কিছু দেখাশুনো করেন। বাড়ির হাল ধরবার তো কেউ নেই বাড়িতে।

দুটো বুড়োবুড়ি, আর একজন ওই আধবুড়ি, এই তো সংসার। অভিভাবক বলতে ওই ছোটকাকা। কিন্তু কী নম্র, কী শান্ত। দিদিমার সঙ্গে যখন কথা বলেন মনে হয় যেন 'গুরুকে' বলছেন।

অথচ বয়সে উনিই বড় সাগরের দিদিমা ওই মৃন্ময়ীদেবীর থেকে।

ওই ছোটকাকা, যাঁর নাম 'অরুণেন্দ্র' তিনির ওই ধরনটি দেখেছে সাগর।

দাওয়ার ধার থেকেই হয়তো জিগ্যেস করেন, 'ধান কি এখন আর

ভানাতে হবে সেজবৌদি?'...নয়তো বলেন, 'আমওলা আম দিয়ে গিয়েছিল?'

এঁদের নাকি আমবাগান আছে, সে-বাগান জমা দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট থাকে কিছু কিছু আম তারা বাড়িতে দিয়ে যাবে খাবার জন্যে।

দিদিমা দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ান।

বলেন, 'দিয়ে গেছে। গোটা কতক। তাও ছোট ছোট! নাতিরা এসেছে!'

বলেন, 'না না চাল এখন যথেষ্ট আছে।

উনি বাজার করে এনে দেন।

মাছ এনে খুঁত খুঁত করেন, 'নাতিরা এসেছে, তেমন মাছ আনতে পাচ্ছি না প্রায়ই চারা মাছ।

দিদিমা বলেন, 'নাতিরা তো বড্ডই মাছ খাইয়ে। পাতে পাড়তে চায় না, যা খায় চিমু।'

'তাহলে ওদের জন্যে রোজই একটু মাংস জোগাড় করতে হয়—'

দিদিমা বলেন, 'রোজ আর কোথায় পাচ্ছো? এনো মাঝে মাঝে—

এই রকম সংক্ষিপ্ত কাটছাট কথা দিদিমার ওই ওঁর ঠাকুরপোর সঙ্গে রীতিমত দূরত্ব রেখে। এবং প্রয়োজনের বাইরে একটিও নয়।

দিদিমার ব্যক্তিত্বই এর কারণ অবশ্যই।

অথচ এমনিতে দিদিমা কিন্তু আর খুব গম্ভীর নয় তবে বেশী কথাও কন না। দিদিমার শাশুড়ী স্নুবিধে পেলেই চুপি চুপি বলেন, তোদের দিদিমা যদি দুটো চারটি কথা বললো তাহলেও প্রাণটা এতো হাঁফাত না। নেহাৎ এই এখন তোরা এসেছিস তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচছি। বৌমা আমার কর্তব্যটি যা করবার সব নিখুঁৎ করলেন কিন্তু তারপরে আর কারুর নয়, ওই বই।...এই যে অরুণ আমাদের জন্যে প্রাণপাত করে কখনো দরকার ব্যতীত দুটো কথা বলে? বলে না। একবাটি চাও কখনো সামনে ধরে দেয় খাও ঠাকুরপো বলে?

আমার তো ভাসুরপো আমি একটু বলি। তা তোদের দিদিমা বলে কি জানিস? 'বসালেই আবার খানিক সময় খরচ বোঝ?'

বুড়ো দিদিমা তাঁর বিশালকায় বপুতে একখানি চওড়া পাড়-শাড়ি জড়িয়ে সারাক্ষণ চৌকিতে শুয়ে থাকেন আর পাখা নাড়েন। ওঁর হাতের মোটা সোনার বালা থেকে ঝিলিক ওঠে।

বুড়ো দিদিমার মাথাজোড়া টাকের ওপর পরা সিঁদুরটা ছড়িয়ে পড়ায় সারা মাথাটা লাল দেখায়।

ওই অরুণেন্দ্র চলে যাবার পর বুড়ো দিদিমা গজ গজ করেন একটা মানুষ চিরটাকাল তোমাদের সংসারের জন্যে প্রাণটা ঢালছে, তাকে এতটুকু ছেদ্দা সমীহ নেই। এই যে ঘরে আম থই থই, দুটো কেটে দেওয়া যায় না? রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে তোমাদের বাজার বয়ে আনলো, এক গেলাশ লেবুর শরবৎ করে দেওয়া যায় না? ও যদি এতো না করতো তোমাদের একটা লোক রাখতে হতো না মাইনে দিয়ে?

দিদিমা হেসে ফেলে বলেন, না করলে তো করতেই হতো। এই আমি যদি শুয়ে থাকতাম আপনাকে নিশ্চয় একটা রাঁধুনী রাখতে হতো।'

দিদিমার ওই নির্মায়িক ভাবটা সাগরের তেমন পছন্দ হয় না। সত্যিই তো। ছোড়দাদু সম্পর্কে কি দিদিমার আর একটু মায়া মমতা দেখানো উচিত ছিল না।

সাগরের এই দিদিমার বাড়িতে রোজগারী লোক বলতে কেউ নেই। তবু যে দিব্যি রাজার হলেই চলে যায় সংসারটি তার কারণও তো ওই মার অরুণকাকা।

বাগানের আম থেকে পুকুরের মাছ থেকে, ক্ষেতের ধনে থেকে সব দেখা শোনা রাখা বেচা ওঁরই ঘাড়ে।

ওই যে কারখানা হয়েছে, তাব কিছু জমি নাকি দিদিমাদের। সেটা বিলি ব্যবস্থা করিয়ে লীজ দেওয়ানো, কে করতো অরুণেন্দ্র ছাড়া?

'অরুণেন্দ্রর অবস্থা এমন কিছু নয়, রেলে চাকরী করতেন, সামান্যই চাকরী, এখন তো রিটায়ার করেছেন। কিন্তু কেউ বলুক দিকি অসহায়দের বিষয় আশায় টাকা-কড়ি থেকে এতোটুকু এদিক ওদিক করেছেন ?

'উপকারীর মর্ম বোঝে না—

এই হচ্ছে—বুড়ো দিদিমার আক্ষে পোক্তি। মাঝে মাঝে এক-দিন নেমন্তন্ন করলে, কি ঘরে তৈরী খাবারদাবার খাওয়ালে। এটুকু মনিষ্যত্ব করবে তো ?

দিদিমা কিন্তু এসবে কান দেন না।

ওঁর যেন কাজ পেলেই হল।

শুনে শুনে সত্যিই একটু খারাপ লাগে সাগরের। দিদিমাকে চক্ষুলজ্জাহীন স্বার্থপর বলে মনে হয়। একটু যেন কাঠখোট্টাও। উনি তো অরুণেন্দ্রর বৌদি হন একটু ভালভাবে কথা বলতেও তো পারেন।

এই একটু আগেই দিদিমাব বিষয়ে এই কথা ভেবেছে সাগর।

অরুণেন্দ্র এসেছিলেন এক থলে চাল নিয়ে। কালোকালো মানুষ রোদে যেন ঝলসে কয়লা।

থলেটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, এতে কিছু বাসমতী আতপ চাল আছে—

দিদিমা কাঠের টুকরোর মত কথা ছুঁড়লেন 'বাসমতী আতপেব অর্ডার কে দিয়েছিল ?'

অরুণেন্দ্র বললেন, 'না না, মানে—হাটে হঠাৎ পেয়ে গেলাম তাই নিয়ে এলাম।'

দিদিমা তেমনি কাঠখোট্টার মত বললেন 'আজ যা এসেছে এসেছে আর যেন না আসে। আতপ খেতে তো আমি! বাসমতীর দরকার নেই।'

অরুণেন্দ্র সেই রোদ্দুরে কপালের ঘাম মুছে চলে গেলেন।

দেখে দিদিমার ওপর খুব রাগ ধরে গিয়েছিল সাগরের।

এখন সাগরকেই সেই অপবাদ দিচ্ছে লতু।

সাগর বললো কলকাতার ছেলেরা সভ্য হয় ভদ্র হয় একথা কে বলেছে তোমাকে ?'

'এমনি মনে হতো

—লতু একটু হেসে বলে, আর মনে হবে না। যা নমুনা দেখছি। যেমন দাদা তেমনি ভাই।'

দাদা !

দাদাব কথা বলে কেন।

সাগর চমকে বলে উঠলো 'দাদার কথা তুমি কী জানো ?'

'জানতে কতক্ষন লাগে ? লতু উদাসভাবে বলে, রাস্তায় দেখতে পেলে চিনতেই পারে না।'

'দাদা ওই বকমই অন্যমনস্ক।'

'তবে আর কি সাতখুন মাপ। এই যে আমি তোকে একটা কীল মারলাম, বলি যে এই আমার স্বভাব।

লতু সত্যিই কথার সঙ্গে সঙ্গে সাগরের পিঠে একটা মাঝারি গোছের কীল বসিয়ে দেয়।

সাগর জীবনে কখনো এরকম বেপরোয়া মেয়ে দেখেনি! গ্রামের মেয়েরা এই রকমই হয় নাকি ? তাব মাও, তো এই গ্রামেবই মেয়ে। আচ্ছা মা না হয় সেকালের মেয়ে আর এই যে বাড়িতে কত কারা যেন সব আসছে মার সঙ্গে দেখা করতে তোদের সঙ্গে মেয়ে টেয়ে নেই নাকি ? লতুর মত বয়সেরও আছে। কেউ তো মুখ তুলে কথাই কয় না।

আর কিনা লতু এই রকম ডানপিটেমি করে বেড়ায়! ওর মা কিছু বলে না ?

কীল খেয়ে সাগরের ভীষণ রাগই তো হওয়া উচিত তবু যেন তেমন হল না।

পিঠের ওই মাঝখানটায় যে চিনচিন করতে লাগলো, সেটা

লাগায় না অন্য একরকম অনুভূতির, তাও যেন বুঝতে পারছে না সাগর।

অতএব সাগর ছিটকে চলে না গিয়ে রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'তোমার মা তোমায় কিছু বকেন না?'

লতু সাগরের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর বিচিত্র একটু হেসে বললো, 'হয়তো বকেন বুঝতে পারি না।'

সাগর একটু কেঁপে উঠলো।

সাগর ওই হাসিটার মধ্য দিয়েই জেনে ফেললো লতুর মা নেই।

সাগরের মায় থেকে লজ্জাটা বেশী হলো। ছি ছি ওই কথাটা কেন বলতে গেল সাগর। না বললে তো লতুর দুঃখের জায়গাটায় নাড়া পড়তো না।

অথচ সাগর কিছু বলতেও পারছে না।

কী বলবে?

দুঃখ প্রকাশ করবে? সান্ত্বনা দেবে? ধেৎ।

সাগর চুপ করেই ওর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

লতুও তাই।

একটু পরে লতু বললো, 'রাগ করলি?'

'রাগ করবো কেন? বাঃ।'

'ওই যে কীল বসিয়ে দিলাম?'

'আরে ও তো ঠাট্টা করে।'

'যাক, বুঝিস তাহলে।'

লতু একটু নিঃশ্বাস ফেলে।

সাগর একবার নড়েচড়ে দাঁড়ায়, প্যান্টটা দুদিক ধরে টেনে কোমরের ওপর একবার হাত বোলায়, তারপর বলেই ফেলে 'আমি জানতাম না সত্যি।'

এর বেশী আর বেশী কথা তার জোগাল না। অথচ এ ইচ্ছেও হচ্ছিল সাগরের কথায় সান্ত্বনার চেহারা দিতে লতুর কাঁধটায় একটু হাত রাখে।

না সে ইচ্ছে কাজে পরিণত করা সাগরের পক্ষে সম্ভব নয়।

লতু কি ভাবছিল কে জানে।

চমকে বললো, 'কী জানতিস না ?'

'তোমার মা নেই।'

সাগরের এই সময় 'তুই' বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই বা পারলো কই ?

ওই হি-হি করা আহ্লাদী মেয়ে, তবু কেনই যে লতুকে নিজের থেকে অনেক বড় লাগে সাগরের !

লতু তো মাত্র স্কুল ফাইন্যাল পাশ।

জেনে ফেলেছে সেটা। আর বয়সে মাত্র আট মাস বেশী।

তবে এতবড় লাগে কেন ? লতু শাড়ি পরে বলে ?

নাকি লতুর ওই মস্তবড় খোঁপাটার জন্যে। যেটা খুলে ছড়িয়ে দিলে ওর পিঠটা সব ঢেকে যায় ?

নাকি লতুর ওই ফর্সা ফর্সা নিটোল হাত দুটোর জন্যে ? হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে যে দুটো দেহের দু'পাশে একটা ছন্দে আন্দোলিত হতে হতে চলেছে। আর নয়তো কি লতুর হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থটার জন্যে ? সাগর নিজে তো রোগাপটকা।

মা বলে, দিন দিন লম্বায় তালগাছ হচ্ছেন ছেলে, চওড়ায় একা' যদি বাড় আছে। জামাজোড়া পরে থাকিস তাই জামা খুললে প্যাকাটি।'

নিজের সেই দৈন্যেই কি স্বাস্থ্যপুষ্ট লতুকে নিজের থেকে বড় লাগে ? আর কিছু ভাবতে সাহস পায় না সাগর।

লতুই এগিয়ে যাচ্ছিল।

সেটা সাগরের হাঁটতে না পারার জন্যে নয় রাস্তাটা লতুর জানা, আর সাগরের অজানা বলে।

লতু বললো, 'সে তো সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নেই।'

'তবে তোমায় কে মানুষ করেছে ?'

'মানুষ ?'

লতু আবার হি হি করে হাসে, মানুষ আবার হলাম কই রে? 'মানুষ হলে এতোবড় মেয়ে রাস্তার মাঝখানে হি হি করে হাসে? মানুষ হওয়া মেয়ে দেখিস সবাইয়ের বাড়িতে। সত্যভরা শান্ত। তবে 'বড় কারা' বলতে পারিস। সেটা পিসি করেছে। মা মরে যাওয়ার পর তখন পিসি যদি দুধ টুধ না খাওয়াতো, পরে ধরে-বেঁধে চান করিয়ে, ভাত গিলিয়ে ঘুম-টুম না পাড়াতো, কবেই অক্কা পেতাম।'

সাগর সত্যিই এমন অদ্ভুত কথা বলা মেয়ে দেখেনি। সাগরের নিজের পিসিরই এক মেয়ে আছে সাগরের কাছাকাছি ইয়েস, সব্বাই তাকে 'ধিঙ্গী অবতার বলে, 'বাচাল মেয়ে' বলে তবু ঠিক এরকমটা নয়।

লতুর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে, লতু সেটাকে চাপা দিতে এইরকম হি-হি করে বেড়ায়।

'লতু' তোমার বাবা?'

জিগ্যেস করে আবার ভয় করে সাগরের।

হয়তো বাবাও নেই লতুর।

কিন্তু সাগরের ভয় ভাঙলো। লতু বলে উঠলো, 'বাবা? বাবা শিউড়িতে থাকে।'

তবু ভাল।

সাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু অত 'কথাতেও' লতু হঠাৎ এমন চুপ মেরে গেল কেন?

সাগরের অত বেশী কথাতেও যেমন প্রাণ হাঁপায়, তেমনি আবার প্রাণ হাঁপাচ্ছে এই স্তব্ধতায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুর, মাঝে মাঝে যে দমকা হাওয়া এসে গায়ে লাগছে তাতেও যেন আগুনের হলকা, তবে লতু এমন একটা গাছপালায় ঢাকা ছায়া ছায়া জায়গা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাথায় রোদ লাগছে না।

সাগর ভাবছিলো, কী বলে একে?

বাগান তো নয়? অরণ্য? ধ্যেৎ। গ্রামের মধ্যে আবার অরণ্য আসবে কোথা থেকে? যদিও পায়ের তলায় শুকনো পাতার শব্দ

উঠছে, সর্বত্র শুকনো পাতার ছড়াছড়ি, বড় বড় সব সাগরের অজানা গাছ তাদের ডালপালা বিস্তার করে আকাশকে প্রায় ঢেকে রেখেছে' তাদেরই গুঁড়িতে শাখাতে নানা·লতানে গাছ যেন জট পাকিয়ে বসে আছে।

সাগর ভেবে ঠিক করলো, একে তাহলে জংগল বলা চলে।

কিন্তু কতক্ষণ হাঁটছে তারা ? এই জংগলের মধ্যে স্তব্ধতা দারুণ অস্বস্তিকর। সাগর এর আগে কখনো এমন অস্বস্তি অনুভব করেনি।

সাগরই স্তব্ধতা ভাঙবে বাবা।

সাগর কথা ভেবে নিয়ে বলে, 'তুমি সিউড়ীতে থাকো না ?'

লতু জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'নাঃ।'

তারপর একটু পরে বলে, 'কে থাকবে বাবা সেখানে। সৎমাকে আমার ভাল লাগে না।'

সৎমা !

তার মানে বিমাতা।

ইস ! লতুর মধ্যে এতো দুঃখ ! আর সাগর ওকে প্রথম থেকে অগ্রাহ্য করছে ?

সাগর লতুর কাঁধটা ছুঁয়ে ফেললো, বললো, 'আমি এসব কিছুই জানতাম না লতুদি !'

কী আশ্চর্য ! সে লতুদি বলে ফেললো, নিজেই অবাক হয়ে গেল সাগর। কই সে তো ভেবে বলেনি। কাঁধটা ছুয়ে ফেলে সাগরের বুকটা ধুক ধুক করে উঠলো। সবটাই যেন তার অজ্ঞাত-সারে হ'লো। 'বিমাতা' শব্দটাই সাগরকে বিচলিত করে ফেলেছে।

লতুর কিন্তু কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না।

লতু একটু হেসে বললো, 'যাক, বললি তাহলে দিদি ?···আমিও ঠিক করে রেখেছিলাম আর উপরোধ করবো না, ইচ্ছে হলে বলবি। আমায় কেউ দিদি বলে না জানিস ?'

সাগর অবাক হয়ে বললো, 'সে কি তোমার থেকে ছোট কেউ নেই ?'

'আছে। পাড়ায়। তারা বলে দিদি, কিন্তু সেগুলো নেহাৎ গুটকে ফুটকুনি বুঝলি ? বললো, আর না বললে। একটা বড় ছেলে বললে সুখ আছে।'

লতু ওর একটা হাত চেপে ধরলো !

বললো, সাবধান ! এখানটায় গর্ত আছে।

সাগরের হাতের এই ধরে রাখা জায়গাটা কেমন জ্বালাজ্বালা চিনচিন করছে।

সাগর আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'কতক্ষণ হাঁটছি আমরা, কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছো ? আমাদের ওখানে তো আরো অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল।'

লতু আবার সেই ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে উঠলো। সাগরের পিঠের ধারে একটা ঠেলা মেরে বললো, এতোক্ষণে সে হুঁশ হলো ? তোদের বাড়ি পৌঁছে ছাড়িয়ে চলে এসেছি।

'সে কী ? তবে কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'

লতু তেমনি হি-হি করে বলে, 'বৈরাগী হয়ে চলে যাচ্ছি। দেখছিস না জঙ্গলে ঢুকেছি। এতোক্ষণে বাবুর খেয়াল হলো। অনেক আগে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। আমি তাহলে তোকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছিলাম বল ? নিশি জানিস তো ? নাকি জানিস না, কলকাতার ছেলে, না জানতেও পারিস।'

'জানবো না কেন ?' সাগর সতেজে বলে 'রাত্তিরবেলা নিজের লোকের মত গলার স্বর করে ডাকে—'

'ওঃ তাহলে জানিস ? আমাদের এখানে একবার একজনকে, ভট্‌চায্যিদের নাম শুনেছিস ? তাদেরই একটা বৌকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'য্যাঃ, ও আবার সত্যি হয় নাকি ?'

সাগর মন্ত্রমুগ্ধতার অপবাদ খণ্ডন করতেই বোধহয় বলে ওঠে,

ওসব তো বানানো গল্প। 'নিশি' যদি থাকে তাহলে একানড়েও আছে, ব্রহ্মদৈত্যও আছে ভূতপেতনীও আছে।'

'নেই তো কী ?'

লতু হাতমুখ নেড়ে বলে, 'কী নেই জগতে ? সব আছে। না থাকলে ভট্‌চার্যদের বৌটা নিশির ডাক পেয়ে গেল কী করে ? রাত তখন দুটো, হঠাৎ ওই বৌটার বরটা দেখলো বৌ নেই, ঘর খোলা। তখন ও চেঁচিয়ে উঠেছে, সবাই এসে গেছে।···দেখে যে সদর দরজাও খোলা। তাহলেই বোঝো ? নেশার ঘোরের মতন চ'লে গেছে। ··· দুদিন ধরে কত খোঁজাখুঁজি, কত লোক কত কি বলতে লাগলো, তারপর দেখা গেল ওই নিশিতে ডাকার ব্যাপার। পুকুরের পাড়ে মরে পড়ে আছে, কাছেই একটা মুখ কাটা ডাব।'

মুখকাটা ডাব।

সাগরের জ্ঞানের পরিধির বাইরে এসব কথা। সাগর যেন নিজেকেই কোথাও মরে পড়ে থাকতে দেখে কোনো একটা মুখকাটা ডাবের সামনে।

সাগরের গলা শুকিয়ে আসে, 'মুখকাটা ডাব কেন ?'

'বাঃ থাকবে না ? ডাবের মধ্যেই তো প্রাণটা ভরে নেয়।'

'এমা তুই দেখছি কিছুই জানিস না। একজনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই তো আর একজনকে মারে। ধর তোর খুব অসুখ করলো, চিনু পিসি নিশির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো, তখন নিশি রাত্তিরে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণটা ডাবের মধ্যে ভরে চিনু পিসিকে দিলো সেই ডাবের জলটা খেয়ে তুই বেঁচে উঠলি।'

'ধেৎ! সাগর এবার বুদ্ধি ফিরে পায়, বলে যতোসব বাজে কথা।'

'বাজে তো বাজে! জগৎ সুদ্ধ, লোক বিশ্বাস করছে, তুই না করলে তো বড় বয়েই গেল।'

সাগর তর্কের সুরে বলে, 'তাহলে আর রাজপুত্র রাজকন্যারা মরতো না।'

'লতু উদাসভাবে বলে, তারা জানে না নিশি-টিশি কোথায় পাওয়া যায়, তাই মরে।'

'নিশি-টিশির কথা শুনতে চাই না আমি, ভাল লাগছে না, বাড়ি চল।'

'বাড়ি?'

লতুর সেই হাসি।

'বাড়ি এখন অনেক দূরে, কোথায় এসে পড়লাম দেখ।'

জঙ্গলের ফাঁক থেকে একটা পুরানো মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

লতু ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, সাবধানে আয়, এখানে কাঁটার ঝোপ রয়েছে। এই হচ্ছে 'সাধক কালীর মন্দির'. খুব পুরনো।'

সাগরের মনে পড়লো মার মুখে এই নামটা শুনেছে। এখানের বিশেষ বিখ্যাত দেবতা।

কিন্তু সাগরের কী দরকার ছিল এখানে আসার?

মন্দির তখনো বন্ধ।

লতু বলে, 'আয় আমরা খানিকক্ষণ এইখানে চাতালে বসে, থাকি, সাড়ে চারটে বাজলে সেবাইৎ এসে মন্দির খুলবে।'

সাগরের পা ব্যথা করছে।

সাগর বিরক্ত হয়ে বলে তা এখানে আসার আমার কী দরকার ছিল?'

'ওমা! তুই রাগ করছিস? আমি বলে কত কষ্ট করে শর্টকাট দিয়ে তোকে নিয়ে এলাম।'

লতুর চোখটা জলে ভরা দেখালো। সাগর ভারী অপ্রতিভ হলো। বললো, সেই তো বলছি। কষ্ট করতে গেলে কেন? আমার এতো ঠাকুরে ভক্তি নেই।

'এই ছিঃ। কী বলছিস সাগর? এই কালী ঠাকুর কী রকম জাগ্রত জানিস? তুই যা মানসিক করবি হবে।'

'অমনি হবে! আমি রাজা হতে চাইছি। হবো?'

'ছাখ ঠাকুর দেবতার সঙ্গে ঠাট্টা করতে নেই। তুই প্রার্থনা কর ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করবি, ঠিক হয়ে যাবে।'

সাগর ঠোঁট উল্টে বলে, 'সে আমি প্রার্থনা না করলেও হবো। যা লিখে এসেছি, সেটা তো আর উল্টে যাবে না?'

লতু বলে, 'বিশ্বাস থাকলে হয়। নইলে আমার মতন গবেট মেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন পায়?'

'তুমি গবেট মেয়ে?'

'নয়তো কী!'

লতু উদাস গলায় বলে, 'একের নম্বরের গবেট।'

মাঝে মাঝেই লতু এই রকম উদাস হয়ে যায়। আর তখনই সাগরের মনের মধ্যে একটা মনকেমন মনকেমন ভাব লাগে।

সাগরের ইচ্ছে হয় ওর হাতটা হাতে নিয়ে চুপ করে একটু বসে থাকতে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে হাসি পায়। কী বোকার মত লাগবে দেখতে।

'আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

সাগর বলে।

'এই সেরেছে!'

লতু বলে, এখানে খাবার জল কোথা? গাঁয়ের লোকেরা ওই পুকুরের জল খায় ঢকঢক করে, তুই তো আর খাবি না?'

'পুকুরের জল? মাথা খারাপ!'

'তাইতো বলছি। তেষ্টা পেয়েছে বললি।'

লতু উঠে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এসে ক্ষুন্ন গলায় বলে, 'কোথাও কিছু দেখছি না। মন্দিরের দরজা খোলা হলে যদি কিছু সুবিধে হয়। আহা তেষ্টা পেয়েছে বললি—

ভারী অস্থির দেখালো লতুকে।

'ঠিক আছে থাক!'

বললো সাগর, 'এখন কটা বেজেছে?'

'ওইতো মন্দিরের চুড়োর কোণে রোদ হেলেছে চারটে, বাজলো বলে।...কিন্তু মন্দিরেও তো গঙ্গাজল—'

লতুর যেন ছটফটানি ধরে।

লতু আবার উঠে যায়।

অনেকক্ষণ লতুকে দেখতে পাওয়া যায় না।

সাগরের ভয় করে।

এই অচেনা মন্দিরের চাতালে একা বসে আছে সে, এদিকে ওদিকে কিছু কিছু একেবারে দেহাতি লোক বসে বসে বিড়ি টানছে; দু'একজনের পরণে তার লাল কাপড়, যা দেখলে ভয় বাড়ে বৈ কমে না।

সাগরের এতোক্ষণে মনে পড়ে সে সেই সাহেব দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'বাড়ি যাচ্ছি' বলে। মা নিশ্চয় তক্ষুনি ফিরে এসেছিল।

তারপর ?

তারপরের অবস্থাটা ভেবে কাঠ হয়ে যায় সাগর।...এতোক্ষণ একথা মনে পড়েনি তার!

মা যখন এসে তাকে দেখতে পাবে না, এবং এদিক ওদিকে কোথাও খুঁজে পাবে না, তখন কী হলুস্থুল পড়ে যাবে, একবারও মনে পড়ল না!

কী হয়েছিল তার ?

সাগরের ভিতরে যেন একটা কাঁপুনি এলো।

এও একরকম নিশির ডাক নয়তো ?

সাগরের কাকার মেয়েটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী সব বলে না ? ভর দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢ্যালা—নিশ্চয় ওই রকম কিছু হয়েছে। নইলে এই এতোটা সময় কিছু মনে পড়েনি কেন ? লতুটার পিছু পিছু চলে আসছিল কেন আচ্ছন্নের মত ? ঝোপ জঙ্গল কাঁটাগাছ সব তুচ্ছ করে ? লতু আসলে কী কে জানে। কেন নিয়ে এলো আমাকে না বলে টলে।

পাগল-টাগলও হতে পারে মেয়েটা।

এই চলে গেল আর যদি না আসে? সাগর কী রকম করে ফিরবে? সাগর কি আর রাস্তা চিনতে পারবে? না আসছে না। নিশ্চয় সাগরকে এইখানে টেনে এনে ফেলে রেখে চলে গেছে।…কেউ সাগরকে খুঁজে পাবে না, আর দু তিন দিন পরে দেখতে পাবে—

মন্দিরেব পিছন রাস্তা ধরে লতুকে আসতে দেখা গেল।

লতুর সঙ্গে একটা ঝাঁকড়া চুল নিকষকালো লোক, কিন্তু তার হাতে ও কী! সাগরের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল, সাগরের পা দুটো মাটিতে পুঁতে বসে গেল।

লতু বললো, 'এই এতক্ষণে সমস্যা মিটলো। আসতে কী চায়? কত তুতিয়ে পাতিয়ে—ওই ওদিকে এর ঘর, অনেক ডাব রয়েছে। লোকে পুঁজো দেবার জন্যে গাদাগাদা ডাব কেনে তো? দাও বাপু, ডাবের মুখটা কেটে দাও।'

নাঃ, আর মাটিতে পুঁতে থাকা নয়. সাগরের পায়ে রেসের ঘোড়ার দুরন্ত ক্ষিপ্রগতি।

ও কী রে, ও কী! ছুট মারছিস কেন? এই সাগর?'

লতুও ছুটতে থাকে।

শুধু এই লোকটাকে হাতের ইসারায় ফিরে যেতে বলে।

লতু অবাক হয়ে যায়।

লতু যা ভাবে তা এই ডাবওয়ালাটাকে দেখে ভয় লেগে গেছে ছেলেটার। সত্যি ঠিক ডাকাতের মত দেখতে। ওকে না নিয়ে এসে একেবারে ডাবটা কাটিয়ে নিজে নিয়ে এলেই পারতাম! জলটা গরম হয়ে যাবে ভেবে—

ছুটতে ছুটতে লতুরও ঘাম ছুটে যায়।

কী বুদ্ধু ছেলে বাবা!

একটা ঝাঁকড়া চুল লোককে দেখে এতো ভয়। আহা এতো কষ্ট করে মা কালীর দরজা পর্যন্ত এসে দর্শন হলো না! লতু নিজেকেও ধিক্কার দিল। নাই বা মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছিল,

ঠাকুর তো আর সত্যি ঘুমোচ্ছে না? লতুর যা মনোবাঞ্ছা সেটা লতু মাকে জানিয়ে প্রার্থনা করলো না কেন।

সাগর ছুটছিল।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মতই ছুটছিল।

ধাক্কা খেলো একজনের সঙ্গে। ধাক্কা খেলো, অথবা তিনি ওকে ধরেই ফেললেন ঝাপটে।

'কী ব্যাপার? তুমি চিনুর ছেলে না? এখানে কোথায় এসেছিলে? ওদিকে তোমার মা কেঁদেকেটে—বোসো বোসো, এখানে বোসো।'

পাড়াগাঁয়ে পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির অভাব নেই। বি এন মুখার্জি অর্থাৎ বিনুকাকা অর্থাৎ বিনয়েন্দ্রনাথ পথের ধারের অমনি একটা বাড়ির ঘাস-গজানো দাওয়ায় সাগরকে বসিয়ে বলেন, 'সব শুনবো, আগে একটু জল খাও।'

নিজের কাঁধে ঝোলানো শ্রীনিকেতনী ঝোলা থেকে ফ্লাস্ক বার করে জল খাওয়ান সাগরকে।

আর তখন সাগরের মনে হয় এই জলটা এই মুহূর্তে না পেলে অজ্ঞান হয়ে যেত সাগর।

সাগরের ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ে কিন্তু এই বয়সের ছেলের পক্ষে অতটা খেলো হওয়া সম্ভব নয়।

যাক এখন সাগর হাতে চাঁদ পেয়েছে, পেয়েছে বনস্পতির আশ্রয়, এখন সামলে উঠতে পারবে।

বিনয়েন্দ্রনাথ বললেন, 'এইবার বল তো অমন ভূতে তাড়া খাওয়ার মত আসছিলি কোথা থেকে?'

সাগর এখন মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

এখন একেবারে অন্যরকম।

ফর্সা খদ্দরের পায়জামা, গলাবন্ধ গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর শাদা খদ্দরের টুপিপরা এই দীর্ঘাকৃতি মানুষটাকে দেখলে সমীহ শ্রদ্ধা না এসে পারে না। মুখের চেহারায় একটি দৃপ্ত আভিজাত্যের ছাপ,

যেটা জানলা দিয়ে দেখে দেখে অনুমান করতে পারেনি সাগর, তেল-মাখা অবস্থায়ও অনুভব করতে পারেনি।

সাগরের এখন এই মনুষটার সামনে সেই ভয় পাওয়ার কারণটা বলতে লজ্জা করলো। সাগর বুঝতে পারলো বলতে গেলে কী ছেলে মানুষী হবে।

এই দিনত্বপুরে সাগরকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সরকারদের মেয়ে লতিকার ছদ্মবেশে, এ-কথা এঁর সামনে বলা যায়?

এঁর সেই উদাত্ত হাসিটা এখনও যে কানে বাজছে। শুনলে সেই হাসিটি হাসবেন তো!

সাগর বললো, 'অন্য রাস্তা দিয়ে যাবো বলে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'রাস্তা হারিয়ে এতো দূর চলে এসেছিলে?'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'আচ্ছা ছেলে তো।...আমি কোথায় ভাবছি তোমায় কোপাইয়ের ওপারে বেড়াতে নিয়ে যাবো—ওদিকে তোমার দাদা দিদিমা সবই খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি ভাবলাম আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? যাক আমারই লাক! কী ছুটেই আসছিলে। গরুতে তাড়া করেছিল না কী?'

সাগর ঘাড় কাৎ করে।

সাগর ভাবে ফাঁড়া কাটলো।

গরুতে তাড়া করলে মানুষ ছুটবে এটা তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সাগরের শনিও যে তখন খাঁড়া উঁচিয়ে ছুটে আসছে তা কী জানা ছিল তার?

সাগর হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।

লতুর মুখটা টকটকে লাল, শাড়িটা এলোমেলো, ব্লাউসটা ঘামে ভিজে টসটসে আর লতুর খোপা ভেঙে পড়া চুলের রাশি সাপুড়ের ঝাঁপি ভেঙে বেরিয়ে পড়া সাপের ঝাঁকের মত ফণা তুলে দুলছে।

লতু হাঁপাচ্ছে।

তবু লতুরও ছুরির ফলার মত ধারালো গলায় বলে উঠলো, 'তুই

এইখানে ? দাছুর কোলের কাছে আহ্লাদে গোপালের মতন বসে আছিস ? আর তোর জন্যে আমি ? এই ছাখ্ হোঁচট খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটার কী অবস্থা !'

সে কী ? কই দেখি ?'

বিনয়েন্দ্র তাড়াতাড়ি নীচু হল।

সাগরও ভয়ে ভয়ে তাকায়। অবস্থা সত্যিই ছঃখজনক। রক্ত ঝরছে এখনো।

'বোস স্থির হয়ে।'

বিনয়েন্দ্র আবার তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকান। ওষুধ আর তুলো বার করে প্রাথমিক চিকিৎসা সমাপ্ত করেন।

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'এসবও আপনার সঙ্গে থাকে ?'

লতু এতক্ষণে একটু আরাম পেয়ে স্থির হয়ে বসে বলে, 'শুধু এসব কী নয় ? পেটের অস্থখ মাথাধরার ওষুধ থেকে শুরু করে সাপে কামড়ানোর ওষুধ পর্যন্ত।'

'কেন ?'

'কেন সাধে বলি বুদ্ধু ? এইটাই তো সাহেবদাছুর দেহাতিদের বস্তিতে বেড়াতে যাবার সময়...ওই নদীর চরে চরে মন্দিরের ওধারে দেহাতিদের বস্তি তো ? দাছু ওদের বিনি পয়সায় ওষুধ দেন। ওদের জন্যে যে ইস্কুল করে দিয়েছেন, তাতে পড়ান, ওদের শিক্ষা-দীক্ষা দেন। ওরা দাছুকে ঠিক ভগবানের মতন ভক্তি করে।'

'আচ্ছা ! যথেষ্ট পাকামি হয়েছে, এখন তোর ইতিহাসটা শুনি। তোকে কে তাড়া করেছিল ? বাঘে ?'

'আমায় আবার তাড়া করবে কে ? লতু ভুরু বাঁকিয়ে ঝঙ্কার তোলে 'ওই বীরপুরুষটিকে জিগ্যেস করুন না।...ছপুর রোদ্দুরে জঙ্গলের পথে শর্টকাট করে ওকে আমি সাধক-কালী দেখাতে নিয়ে গেলাম, ওর তেষ্টা পেয়েছে বলে ডাবওলাকে খোসামোদ করে ডেকে নিয়ে এলাম, আর ও কিনা সেই লোকটার ঝাঁকড়া চুল আর কালো রং দেখে দৌড় মারলো। কলকাতার ছেলের সাহস দেখলাম বটে।'

বিনয়েন্দ্র একটু চুপ করে থেকে গভীর গলায় বলেন, 'তুমি তো এসব কথা বলনি ইয়ে—।'

'সাগর !'

'হ্যাঁ, সাগর। তুমি তো অন্য কথা বললে।'

সাগরের মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে।

লতু সন্দেহ সন্দেহ গলায় বলে 'কী আবার বলেছে ?'

'অন্য কথা বলেছে। কিন্তু কেন বল তো ? তুমি চিনুর ছেলে তোমার ব্যাপারটা তো আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। উল্টো কথা বললে কেন, এর কারণটা তো আমায় জানতে হবে।'

সাগর এই প্রায় অপরিচিত মানুষটার গলায় অভিভাবকের দৃঢ়তা দেখে হঠাৎ কেঁদে ফেলে। এতোক্ষণের ভয় কষ্ট সবকিছুর প্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

অবশেষে বলতেই হয় সাগরকে তার মিথ্যা ভাষণের কারণ। লজ্জা ! লজ্জাতেই কথা বানিয়েছে।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে, রোদে ঝকঝকে শাদা আকাশ নানা বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমারোহে যেন কোনো এক নিগূঢ় উৎসবের আয়োজন করছে।

লতুকে আর এখন তেমন অগ্নি-মূর্তি দেখাচ্ছে না। কোমল একটি লাবণ্যের ছায়া ওর সর্বাঙ্গে। সাগর তখনও তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না, এখনো পাচ্ছে না।

লতু গিন্নীদের মত কপালে হাত রেখে বলছে, 'হায় কপাল ! তুই আমায় ছদ্মবেশী 'নিশি' ভাবলি ! আমি মুখে-কাটা ডাব নিয়ে তোর প্রাণ হরণ করতে আসছিলাম ! শুনে যে আমার বিষ খেতে ইচ্ছে করছে রে !'

আর বিনয়েন্দ্রনাথের সেই হা-হা হাসি যেন আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়ে।

তোরও দোষ, তুই বা ওকে নিশিতে পাওয়ার গল্প করতে গেলি কেন? ও বেচারা শহরের ছেলে, অত-শত জানে না—'

বিনয়েন্দ্রই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সাগরকে। দরাজ গলায় হাঁক পাড়লেন, 'চিনু কোথায়? সন্দেশ খাওয়া। ছেলে খুঁজে এনে দিলাম।'

এতোক্ষণ চিনু বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলে ছেলে করে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল ছেলেকে পেলে জীবনে তাকে বকবে না।

কিন্তু যেই না আস্ত সুস্থ ছেলেকে দেখা, তেড়ে আসে বকতে।

'কোথায় ছিলি এতোক্ষণ হতভাগা ছেলে—'

'নো নো!'

বিনয়েন্দ্র চিনুর সামনে হাত নেড়ে বলেন, 'নো মাই গার্ল! বকা চলবে না! জিগ্যেস করাও চলবে না। তোমার ছেলে ভয়ঙ্কর মারাত্মক এক আত-তায়ীর হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছে। অভিনন্দন জানাও ওকে। আর কই? আমার সন্দেশ কই?'

লতিকা সকাল থেকে বহুবার চেষ্টা করছে চ্যাটুয্যে দিদিমার বাড়ি গিয়ে ওনার নাতির খবরটা নিয়ে আসে। এটা তো জিগোস করতে হবে, কী হে বীরপুরুষ! রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল? না চমকে চমকে উঠেছিলে?

জিগ্যেস করতে গেলে কি হতো বলা শক্ত।

লতুর সন্দেহটা তো মিথ্যে নয়।

সাগর নামের ছেলেটাকে বুঝি নিশিতেই পেয়ে বসে আছে। নইলে কেন এখনো ওর অবস্থা আচ্ছন্নের মত? কেনই বা অবিরত সেই বেদের ঝাঁপি ভেঙে বেরিয়ে পড়া এক ঝাঁক ফণা-তোলা সাপ তার চোখের সামনে দুলেই চলেছে?

আর কেন সমস্তক্ষণ তাকে মরমে মোরে সেই সকরুণ আক্ষেপ ধ্বনিটা বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, 'হায় কপাল। তুই আমায় ছদ্মবেশী 'নিশি' ভাবলি?'

আমার যে বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে রে!'

সমস্ত ঘটনাটা শেলেটের লেখার মত যদি হাত দিয়ে মুছে ফেলা যেত!

হয়তো লতুও ভাবছিল, মরতে আমি ওকে ওই নিশি পাওয়ার গল্পটা বলতে গিয়েছিলাম। গিয়ে তাই বলিগে। বলি আমরা তো আজন্মই এসব শুনছি। ভূত প্রেত দত্যি দানো কিছুরই অভাব নেই আমাদের এই ফুলঝাঁটিতে।

কিন্তু বলতে যাওয়া হল না।

বৈঠকখানা বাড়ির সামনে একজন আটকালো ওকে। গম্ভীর গলায় বললো, 'কাল সাগরকে ওভাবে ভয় দেখিয়েছিলে কেন?'

লতু চোখ তুলে তাকালো।

বাচাল লতু, বেপরোয়া লতু মুখরা আর প্রখরা লতু একেবারে মূক হয়ে গেল। লতু চোখ নামিয়ে নিলো।

লতুর সেই চোখের অন্তরালে গরম বাষ্পোচ্ছ্বাস উথলে উঠতে চাইলো।

সেই গম্ভীর গলা আবার বলে উঠলো 'ও তোমাদের এই গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের মত পাকা নয়, ওকে ওই সব ভয়ের গল্প বলতে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। সায়েব দাদুর সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে যথেষ্ট বিপদ হতে পারতো ওর।'

লতুর সেই প্রতিক্ষণ খৈ-ফোটা মুখ এমন তালা-চাবি আঁটা হয়ে গেল কী করে? লতুর মুখ আরো নীচু হয়ে গেল! লতুর চোখ লজ্জা সরম রাখতে দিল না।

এই নির্লজ্জ চোখ দুটো নিয়ে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না?

লতু ঝপ্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে।

ওর ওই চলে যাওয়া দেখে প্রবাল একটু অপ্রস্তুত হয়। এতোটা হবে ভাবে নি। সে সাগরের দাদা, সাগরের থেকে বড়, অতএব অভিভাবকের ভূমিকা তার নেওয়া উচিত, এমনি একটি মনোভাব নিয়ে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে বাচাল মেয়েটাকে একটু 'টাইট' দিতে

এসেছিল। ধারণা ছিল নিজের দোষ স্খালনের জন্য মেয়েটা খুব তড়পরে এবং প্রবাল তার উত্তরে আর একটু শাসনস্থখ করে নেবে।

প্রবাল তো আর ছেলেমানুষ নয়, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে তার।…মাঝে মাঝেই দেখে মেয়েটাকে দিদিমার কাছে, মার কাছে বসে বসে বকবকায়, প্রবালকেও 'প্রবালদা' করে কথা বলতে আসে। তবে প্রবাল গ্রাহ্য করে না।

বলতে গেলে ইচ্ছে করে তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখায়। এই যে সেদিন হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে বলে উঠলো 'প্রবালদা চিনুপিসি বাড়িতে আছেন ?'

'চিনুপিসি বাড়ি আছেন কিনা, সেটা বাড়ি গিয়েই দেখগে যা। তা নয় গায় পড়ে কথা কইতে আসা।'

প্রবাল যদি তখন ভাল করে একটা উত্তর দেয়, নির্ঘাৎ আরো কথা বলতে বসবে। প্রবাল তাই গম্ভীরভাবে বললো, 'জানি না।'

প্রথম দিনই ওর ওপর রাগ হয়ে গিয়েছিল প্রবালের।

'চিনুপিসি, তোমার ছেলেদের নাম দুটো কী সুন্দর! প্রবাল আর সাগর। কখনো এমন চমৎকার নাম শুনি নি। তোমার যদি একটা মেয়ে থাকতো কী নাম রাখতে ? ঝিনুক ?'

চিনুপিসির ছেলেদের নামের ব্যাখ্যায় তোর কি দরকার বাবা। মানে বুঝিস এসব নামের ? তা প্রবাল যে ওকে গ্রাহ্য করে না, তাচ্ছিল্য করে, সেটা বুঝেও তো যাওয়া আসায় কিছু কমতি ছিল না, আজই হঠাৎ এতো অপমান হয়ে গেল।

নিজের দিকে যতই যুক্তি রাখুক, অপ্রতিভ একটু হলোই প্রবাল। অতএব আরো যুক্তি জড়ো করতে লাগলো তা হোক, একটু টাইট দেওয়া ভাল। গ্রামের মেয়ে তুমি এতো ধিঙ্গী কেন ?'

আর সরকার বাড়ির লতিকা নামের সেই মেয়েটা ?

তার তো দারুণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, সে বালিশে মাথা চেপে শুয়ে থাকবে না।

তার পিসি এসে সাধ্য সাধনা করে একটু গরম দুধ খাওয়ালো।

আর খুড়ি ঠোঁট বাকিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'ঠাকুরঝিই মেয়েটার মাথা খেলেন।'

লতুর বাপ অনেকবার চেষ্টা করেছে লতুকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে, পিসিই যেতে দেয় নি। বলেছে, মা মরলে বাপ তালুই। মেয়েকে নিয়ে যাবার দরকার তো তোর নতুন অপোগণ্ডগুলোর কন্না করবার জন্যে? এক ঝাঁক তো ছেড়েছে নতুন বৌ?

বাপ রেগে বলেছিল, 'এখানেই বা তফাৎ কী? সৎমা পর, কাকীই বুঝি বড় আপন?'

পিসি বললো, 'আপন নয় সেটাই সুখের! এ তো জানছে কাকার সংসারে কাকী। আর চোখের ওপর যখন দেখবে বাপের সংসারে আর একজন গিন্নীত্ব করছে, বাপ জোড়হস্ত হয়ে পড়ে আছে, সেটা হওয়া শক্ত। মেয়েকে একেবারে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে তবে আমি মরবো।'

অতএব কাকী যদি বলে 'ঠাকুরঝিই মেয়েটার মাথা খেলেন।' ভুল বলে না।

কিন্তু সে মেয়ে অন্যের মাথা খাবে এটা তো ভালো কথা না? অনেকেই এ প্রশ্ন করছে।

টর্চটা পকেটে ফেলে বাড়ির বাইরের দরজার শেকলটা তুলে দিচ্ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ, দেখতে পেলেন গগনদের বাড়ির পাশের গলি থেকে একটা আলোর রেখা।

ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে।

একটু হতাশ গলায় স্বগতোক্তি করলেন 'এই এক পাগল!'

আলোটা কাছে এসে গেল।

তার সঙ্গে ধবধবে থানে মোড়া একখানি অবয়ব। পটেশ্বরীর মত সর্বদা এমন ফরসা থান, ফুলঝাঁটির আর কোনো বিধবা পরে না।

পটেশ্বরীর এক হাতে হ্যারিকেন আর অন্য হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার। এটা সকলের থেকে কিঞ্চিৎ ছোট।

বিনয়েন্দ্র শেকলটা না লাগিয়ে দরজা হাট করে দিয়ে সরে এসে বলে উঠলেন, 'আবার তুই মরতে মরতে এলি? সকালে কী বলে দিয়েছিলাম?'

পটেশ্বরী হাতের জিনিস দুটো নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে বিনয়েন্দ্রর 'ডিনার টেবল' অর্থাৎ মেলায় কেনা সস্তা কাঠের চৌকো টুলটা টেনে এনে মাঝখানে বসিয়ে বলেন, 'যাতে যখন শয্যাশায়ী হবো, তখন আর আসবো না। এখনো যখন হেঁটে চলে সবই করছি, তখন আর এটুকু আসতে মরে যাবে না।'

'আরে বাবা, আমিই কি ওইটুকু গিয়ে খেয়ে আসতে ক্ষয়ে যাব?'

পটেশ্বরী টেবিলের ওপর থালা পেতে টিফিন কৌটো খুলে সাজাতে সাজাতে বলেন, 'নিয়ে আসতে আমিও ক্ষয়ে যাব না।'

তারপর ঘরের অন্য একদিকে একটা বেতের মোড়া টেনে এনে পেতে দিয়ে বলেন, কথা রেখে এখন খেতে বসো তো।

বিনয়েন্দ্র বসে পড়ে থালায় চোখ ফেলে বলেন, 'এই দেখো, আবার সেই একগাদা বেঁধে মরেছিস? তোকে নিয়ে আর পারা যাবে না।'

'পেরো না।'

বলে নিজেও একটা টুল টেনে বসে পটেশ্বরী নিজস্ব অভ্যাসে আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে থাকেন।

বিনয়েন্দ্র রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে পরিতৃপ্তির গলায় বলেন, 'তুই যা বলিস মিথ্যেও নয়। নিজের জায়গায় বসে খাওয়ায় একটা স্বস্তি আছে। তোদের ওখানে গেলে পুঁটুর মেয়েরা বাতাস করতে ছুটে আসে, জটাইয়ের বৌ হাতে জল দিতে ছুটে আসে, অস্বস্তি লাগে।'

'স্বীকার করছো তাহলে?'

পটেশ্বরীর আঁচল নাড়াটা স্থগিত রাখেন।

'এসবই তোর রান্না?'

'এ বেলায় তো সবই নিরিমিষ, আমার ছাড়া কার ? মাছটা জটাইয়ের বৌ রাঁধে সকালে।'

নারকেলের ডালনাটা যা একখানা রাঁধিস ! সত্যি ফাস্টক্লাশ।

থামো বিনুদা। তোমার হ'য়েছে, লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা। রাজবেশ ছেড়ে বাখাল বেশে পড়ে থাকা ! দেখে দেখে আমাব মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে !

'এই খববদার। যা ইচ্ছে কবে তা কবতে বসিসনে যেন।'

'নাঃ ! করতে আব পারা যায় কই ?' পটেশ্বরী বলেন, 'আমার তো তোমাব বৌয়ের কাছে গিয়ে তেড়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে কবে।'

বিনয়েন্দ্র হেসে ওঠেন, 'তা এটা যদি তোর সাহস থাকে যা। মানা কবছি না।'

'আমার খুব সাহস আছে। পটেশ্ববী কাউকে ভয় কবে না।'

'তবে গেলেই পারিস।'

পটেশ্ববী আবাব আঁচল ঘোরাতে ঘোবাতে বলেন, 'যাই না অনেক দিক ভেবে।'

কিছুক্ষণ একমনে খেয়ে যান বিনয়েন্দ্র, তারপর বলে ওঠেন, 'কিন্তু পটাই। সেই যে একটা কাজ কববার ছেলেব কথা বলেছিলাম, রাঁধতে টাঁধতেও পাববে, বর্ধমান থেকে আনবাব কথা ছিল তাব কী হল ?'

পটেশ্বরী ক্ষুব্ধ গম্ভীর গলায় বলেন, 'তবে যে বললে নারকেলের ডালনাটা ফার্ষ্টক্লাশ ! বানিয়ে বললে ?'

'আরে ! কোথাকার কথা কোথায় ! হঠাৎ একথা ?'

'না বোঝবার মত কমবুদ্ধি ছেলে তুমি নও বিনুদা !'

বিনয়েন্দ্র ফের গলা ছেড়ে হাসেন।

'আসল কথাটা তা হলে ধরেই ফেলেছিস ? তোর রান্না আর মুখে রুচছে না বলে একটা নতুন হাত খুঁজছি।'

'তা ছাড়া কী বলবো ? একটা রাস্তায় বেড়ানো, ছোড়া ধরে

এনে তোমার খাওয়া দাওয়া তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো এই কথাই তো বলছো তুমি ?'

বিনয়েন্দ্র সহাস্যে বলেন, 'তুই চিরকাল একরকম রইলি। কিন্তু পটাই তুই আর কতোকাল ভূতের বেগার খাটবি ?'

পটেশ্বরী সহসা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'চললাম। বসে বসে কতকগুলো আগড়ুম বাগড়ুম শোনার দরকার নেই আমার।'

বিনয়েন্দ্র বলেন, 'এই ছ্যাখো ! নাঃ। সাধে বলি তোকে নিয়ে পারা যায় না।··· চলে যাচ্ছিস ? ঠিক আছে, এই রইল তোর চিঁড়ের পায়েস—'

'হয়েছে' !

পটেশ্বরী আবার বসে পড়ে বলেন, 'পটাই আবার কী এমন একটা মানুষ বিনুদা ? যে তার জন্যে তোমার চিন্তা ? ভূতের বেগার খাটতে পাঠিয়েছে ভগবান, জ্ঞানবধি তাই খেটে চলেছি। তবে ভূতে ভগবানে তফাৎ বোঝবার ক্ষমতা নেই, এতো অধম নই।'

'তবে নাচার ?'

বিনয়েন্দ্র হেসে বলেন, 'ভগবানের নৈবিদ্যি সাজিয়ে পরকালের কাজ কর।'

পটেশ্বরী আবার আঁচল ঘোরাতে ঘোরাতে শুরু করে বলে ওঠেন, 'কিন্তু এও মাঝে মাঝে ভাবি বিনুদা, তোমারই বা এটা কী জীবন।'

'বিনয়েন্দ্র বলেন, 'কেন, জীবনটা মন্দই বা কী ?'

'খুব ভাল !'

'ভালই তো ! যেভাবে ইচ্ছে চরে বেড়াচ্ছি, কাজ করছি, না করছি আর ঘরে বসে তোফা পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাচ্ছি-দাচ্ছি। খাওয়ার জন্যে লোককে বাজার রে দোকান রে কত হাঙ্গামা করতে হয়, এ একেবারে আঙুলটি নাড়াতে হচ্ছে না। এমন সুখের জীবন আর কী হতে পারে ?'

আহারে মরি মরি। চিরকাল যেন তুমি নিজেই খেটে পিটে

সংসার করেছো ? এ হচ্ছে তোমার শখের কাজল পরে চোখ জ্বালানো ! সুখে থাকতে ভূতের কীল খাওয়া ! এখন পটাই কত ভূতের ব্যাগার খাটাবে, সেই চিন্তায় ঘুম নেই ।'

বিনয়েন্দ্র খেয়ে ওঠেন ।

হাত ধুয়ে এসে বলেন, 'চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি ।'

'শোনো কথা । আমায় আবার পৌঁছে দেওয়া ! ভূত পেতনী সাপখোপ চোর ডাকাত সবাই পটাই বামনীকে ডরায় ।'

'তা হোক । আমি তোর গুরুজন, সেটা ভুলে যাস নি !' হাহা করে হেসে ওঠেন । আমার একটা দায়িত্ব নেই ?

অতএব গলগলিয়ে গল্প করতে করতে প্রৌঢ় ছুই ভাই বোন পথ মুখরিত করতে করতে যান ।

গগনদের বাড়ির জানলার নীচে দিয়ে যাবার সময় গগনের পিসি স্বগতোক্তি করেন, 'ফিরলেন পটেশ্বরী গুরুসেবা সেরে ।'

আর গগনের বাবা মনে মনে ভাবলো 'পটাইদি একটা ভাল তালুক বাগিয়েছে । বিনুদার দেওয়া খাই খরচা থেকেই বোধহয় পুঁটু ভটাইয়ের হেঁসেল খরচটা চলে যায় ।......সে ইয়ে না থাকলে আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এমনভাবে হাস্য-বদনে চালানো যায় না বাবা !'

ওদের দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে দিয়ে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ফিরে আসেন বিনয়েন্দ্র । তক্ষুনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন না ।

বাড়ির সামনে রোয়াকের ছু পাশের সীমেন্ট গাঁথান চেয়ারের একটায় বসেন ।

কোথা থেকে যেন বেল যুঁইয়ের গন্ধ ভেসে আসছে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশের নক্ষত্রগুলো ঝিকমিক করছে, ভারী ভাল লাগছে !

ভাল লাগতে লাগতে যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন ! তলিয়ে গেলেন চিন্তার গভীরে ।

এই সংসারের পাওয়া না পাওয়া হারজিত, লাভ লোকসান; সব কিছুর উর্ধ্বে যেন একটি শান্তির সাগরে আশ্রয় পেয়েছেন ।

'ভুল করেছি' একথা কোনোদিন ভাবেন না, বিনয়েন্দ্রনাথ ।

উচ্চপদে যখন আসীন ছিলেন, স্ত্রীর ইচ্ছার প্রাবল্যে এবং পদ-মর্যাদার তাল বজায় রাখতে জীবনযাত্রায় ছিল আড়ম্বর, ছিল বিলাস বহুলতা, কিন্তু সেই জীবনটা কি বিনয়েন্দ্রর নিজের জীবন ছিল ?

সে জীবনে কি কোনোদিন বিনয়েন্দ্র এমন একখানি স্তব্ধ প্রকৃতির মুখোমুখি প্রকৃতিরই একাংশের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পেরেছেন ? তলিয়ে যেতে পেরেছেন আপন চিন্তার গভীরে। অথবা চিন্তাবিহীন, সুখ দুঃখে ভাল-মন্দর অনুভূতিহীন একটি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে !

সুরমাকে তিনি কোনোদিন আপন রুচির সঙ্গে মেলাতে পারেন নি।...তার জন্যে, বিনয়েন্দ্র কোনোদিন সুরমাকে দোষ দেন না।

মানুষ মাত্রেরই আপন রুচিমত থাকবার অধিকার আছে, বিনয়েন্দ্র এ সত্যে বিশ্বাসী।

সুরমা যদি এই অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে না পান, সুরমা যদি বাড়ি গাড়ি, দাসদাসী অলঙ্কার অহঙ্কার, এই-গুলোকেই সার্থক জীবনের চরম নিদর্শন বলে মনে করেন, বিনয়েন্দ্রর কোনো অভিযোগ নেই। তবে এটাও ঠিক, সুরমার অভিযোগ বিনয়েন্দ্রর মনে অপরাধবোধ জাগায় না।

সুরমা তো কম লড়াই করেন নি !

তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন, বুনো রামনাথ বলে বিদ্রূপ করেছেন, পাগল বলেছেন, বুদ্ধিভ্রংশ বলেছেন, বিনয়েন্দ্র টলেন নি। ওঁর সেই কাঠ কবুল—সভ্যতার খোলস' এঁটে আর নয়।

পড়ন্তবেলায় বালুর চড়ার ওপর বসে একটি সদ্য উন্মেষিত কিশোর মনের কাছে ওই কথাটাই বলছিলেন বিনয়েন্দ্র।

যেটাকে 'সভ্যতা' বলে গৌরব করা হয়, সেটা হচ্ছে সভ্যতার খোলস।' এই সব আদিবাসীদের মধ্যে যে সভ্যতা বোধ আছে, তা তোমাদের তথাকথিত সভ্য ব্যক্তিদের মধ্যে নেই। অথচ ওই খোলস আঁটা সভ্যরা অ-সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাচ্ছেন। 'সভ্যতা'

নামের ওই কলঙ্কিত খোলসটা ক্রমশঃই মানুষের সব কিছু ঢেকে ফেলছে। দিনের দিন লোভ বেড়েই চলেছে মানুষের। আর লোভই হচ্ছে সকল দুর্নীতির জন্ম-দাতা।'

ছেলেটা মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিল ওই দৃঢ় প্রত্যয়ের মুখকে। সাগরের বাবাও নীতি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে, মানুষ যে ক্রমশঃই 'উচ্ছন্ন' যাচ্ছে, একথা বাবা সর্বদাই সরবে ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু বাবার মুখে এই বেদনার ছাপ নেই এই প্রত্যয়ের ছাপ নেই।

সেই বিশ্বাস প্রত্যয়ের ছাপে উজ্জ্বল মুখটা তখনো বলে চলেছিল, এই সভ্যতার ধ্বংস না হলে, সমাজের কোনো উন্নতি নেই। মানুষ ক্রমেই নিজেকে লোভের পাঁকে পুঁতে ফেলে তলিয়ে যাবার, সাধনা করবে।...তুমি হয়তো ভাবছো, তুমি তো একটা ছেলেমানুষ ছেলে, তোমায় এসব বলছি কেন? ভেবে দেখছি তোমাদের মত ছেলেমানুষদেরই এ সম্বন্ধে চেতনা আসা দরকার। লোভের কোনো শেষ নেই, চাহিদার সীমারেখা নেই, কতোদূরে যাবে তুমি? কতদূরে? ...টাকার পাহাড় জমিয়ে তুললেও তো মানুষ—আর দরকার নেই' বলে ছেড়ে দেবে না? দরকারটাকেই বাড়িয়ে তুলবে। সে দরকার হবেই—দেয়ালের মধ্যে পুঁতে রাখার।'

রোদ পড়ে এসে সোনালী আলোয় চারিদিক ভরে গেছে, গ্রীষ্মের নদী অনেক নীচু দিয়ে বয়ে চলেছে, তার কলধ্বনি নীরব। দূরে দূরে তিন-চার পাঁচজনে দল বেঁধে আদিবাসী দেহাতী মজুরেরা কাজ সেরে ঘরে ফিরছে।

মজুরনীও যাচ্ছে জন কয়েকে মিলে পরস্পরের কোমর বেষ্টন করে গান গাইতে গাইতে। ওরাও যেন এই মুক্ত প্রকৃতির এক অংশ।

বিনয়েন্দ্র যেন ক্রমশঃ নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছেন, 'সবচেয়ে ক্ষমতা-শালীরাই সবচেয়ে অসহায়, এই হচ্ছে ট্র্যাজেডি। কোথায় তারা অসহায় জানো? লোভের কাছে।...তাই নিজের হাতে গড়া আইন যন্ত্রের দুর্বল স্ক্রুগুলো খুঁজে বেড়ায়, যন্ত্রটা ঢিলে করে ফেলে

সুবিধে করে নিতে। নিজের হাতে বাঁধা নিয়মের বেড়ার বাঁধনগুলোকে নেংটি ইঁদুরের মত লুকিয়ে বসে কাটে তা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু এতো যে নীচতা, এতো যে ক্ষুদ্রতা এতো নোংরামী আর নির্লজ্জতা, এর বিনিময়ে কী পাচ্ছো তুমি ?'

'কী পাচ্ছো তুমি !'

এ আবার কী কথা !

সাগর ব্যাকুল হলেও অস্ফুট গলায় বলে আমি। আমি তো কিছু—'

'তুমি তো কিছু করো নি ?'

এই গভীর গম্ভীর পরিবেশের মাঝ-খানে বিনয়েন্দ্রব হা হা করা হাসিব আওয়াজটা যেন বেমানান লাগে।

হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন. তা তুমিও যে কিছু কবতে পারো না তা নয় ? ইচ্ছে করলেই তুমি পবীক্ষাব সময় টুকে মেবে পাশ কবতে পারো। সেটা তো তোমাদেব মত ছেলেদের প্রায় পেশা।

বিনয়েন্দ্রর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

সাগর এ অপবাদটি বরদাস্ত কবে নিতে পারে না। বলে ওঠে 'আমি কক্ষণো টুকি না।'

বিনয়েন্দ্র হাসেন, 'জানি জানি। বুঝতে পেরেছি সে কথা। তাই তো তোমার কাছে বলতে বসেছি একথা। তোমরা যদি এই পচে যাওয়া পৃথিবীকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারো। আমার কি মনে হয় জানো, এই আমাদের সমাজটার যেন 'ক্যানসার' ধরেছে। শিরায় শিরায় শেকড় চালিয়ে পচ ধরাচ্ছে সে। নির্মমভাবে অপারেশনের ছুরি চালাতে পারলে তবে যদি—কিন্তু কে চালাবে ? সকলের মধ্যেই যে রোগের বীজ !…

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়া হয়ে গেছে, বিনয়েন্দ্র উঠে পড়েন, বলেন 'চলো ফেরা যাক।'

সাগর নিঃশব্দে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাগরের মনের

মধ্যে কিসের যেন একটা ভার টলমল করতে থাকে। এ কী সদ্য জাগ্রত চেতনার ভার ?

কিন্তু এসব কথা কি সাগর এই প্রথম শুনলো ? এ তো তার জ্ঞান থেকেই শুনে আসছে। সাগরের নিজের কাকাই তো লেকচার দেয়, এ জাতের বারোটা বেজে গেছে। এর হাড়ে হাড়ে ঘুন, শিরায় শিরায় ক্যানসার হবে না ; এযুগে যে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েই শিশু দেখতে থাকে চারিদিকে শুধু দুর্নীতি। সেই বিষের হাওয়া নিঃশ্বাস নিচ্ছে তো ? বিষের থলিই সঞ্চয় করছে।

সাগর হাঁ হয়ে শুনেছে।

কিন্তু তক্ষনি কাকা চলে গেলেই বাবা বলতো, 'আর ভাঁওতা' দিসনে।'

এসব কথার মানে আগে আগে বুঝতো না সাগর। এখনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের আলো-আঁধারিতে কাকাকে আর তেমন আপন মানুষ মনে হয় না।

স্কুলের ছাত্র ইউনিয়নেব সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাসও তো বলে।

আরো উগ্রভাবে, আরে কড়া করে বলে।

বলে, এই পচা গলা সমাজকে ভেঙে গুড়িয়ে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে শুভ-বুদ্ধির ঘৃত প্রদীপ জ্বেলে নয়, রামধুন গাইয়ে নয়, আর সাম্যব্যদের বুলি কপচে নয়, গড়তে হবে বেতিয়ে গায়ের চামড়া তুলে। নেহরু বলেছিল ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে বেত মাববে, যা বলেছিল করে নি, আমরা করবো। যেখানে যত চোরা-কারবাবি আর কালোবাজারী আছে যত ভণ্ড বাবা মহারাজ আছে যত ছদ্মবেশী 'সমাজসেবী' আর 'মানবদরদী' আছে তাদের খোলস ছাড়িয়ে ফেলে ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে শুধু চাবুক ! আইনের দ্বাবা কিছু হবে না। যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। কাজ হবে স্রেফ চাবুকে।

বলতে বলতে অনিল বিশ্বাসের মুখটা কঠিন কুৎসিত হয়ে যায়।

অনিল বিশ্বাসের মুখের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে, আর সেই রেখায় রেখায় উপচে ওঠে শুধু ঘৃণার জ্বালা।

অনিল বিশ্বাসের মুখে কোনোদিন এমন গভীর বেদনাবিদ্ধ ভাব দেখেনি সাগর।

বিনয়েন্দ্র চলতে চলতে তেমনি আত্ম-মগ্ন ভাবেই বলেন, ভেবে ভারী বিস্ময় লাগে, আকাশের এই উদার অপার মহিমা-ময় সৌন্দর্য যা প্রতিক্ষণে রূপ আর রং বদলে বদলে মনকে উপলব্ধির একটা অনির্বচনীয় লোকে পৌঁছে দেয়, এ কি কোনোদিন ওদের চোখে পড়ে না? ওদের কি একবারও মনে হয় না 'এখানে আমরা মানুষরা কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, কতো ক্ষণকালের!'...তাই আমি চিরকালের, এ পৃথিবী সব ধ্বংস হয় হোক, আমি অমর 'অবিনশ্বর', এই আহ্লাদে ভরপুর হয়ে শিশুর খাদ্যে ভেজাল দেয়, রোগীর ওষুধে ভেজাল দেয়, আর অবোধ মানুষগুলোকে হাতিয়ার করে তোলবার জন্যে তাদের আত্মাকে কিনে ফেলে তার মধ্যে ভেজালের কারবার চালায় ...অথচ দেখো এই অবাধ খুনের ব্যবসা চলে আসছে, চলছে। আর মজা এই, দেশে বড় বড় পণ্ডিত আছেন, চিন্তাশীল আছেন, সমাজবিজ্ঞানী আছেন। এঁরা তাকিয়েও দেখেন না, কী আত্মঘাতী পথ ধরেছি আমরা। শিল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে আর মানুষের মধ্যেকার পশুটাকে নিয়ে উন্মাদ খেলায় মেতেছি আমরা।... লক্ষ্যটা কী? ক্ষমতা, আর টাকা। দুষ্প্রবৃত্তিকে জোগাবার ইন্ধন।'

সাগরের মনে হয়, ওই মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। সাগরও কি হারিয়ে যাবে?

একটুক্ষণ পরে চুপ হয়ে যান বিনয়েন্দ্র আর যখন তারা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা সমান রাস্তায় এসে পড়ে বিনয়েন্দ্র হঠাৎ সাগরের পিঠে একটা থাবড়া বসিয়ে বলেন 'কী হে নাতি সাহেব খুব ঘাবড়ে গেছিস তো? ভাবছিস আচ্ছা এক পাগলা বুড়োর খপ্পরে পড়েছি।'

সাগর বেশী কথা বলতে পারে না, শুধু বলে 'ধ্যাৎ!'

বিনয়েন্দ্র হেসে বলেন, 'তাহলে বলতে হবে তুই খুব সাহসী। ঘাবড়াবারই তো কথা। বুড়োটা তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে সাঁওতালি বস্তিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো, কতকগুলো গণ্ডমুখ্যু আদিবাসীর বাৎচিৎ শোনালো, আর তারপর নদীর চড়ায় টেনে এনে একা কব্জায় পেয়ে লেকচার ঝাড়তে বসলো! কে না ঘাবড়াবে?

সাগর এবার সাহস সংগ্রহ করে।

সাগর বেশ সতেজে প্রতিবাদ করে, 'আমি মোটেই ঘাবড়াইনি।'

'ঘাবড়াসনি? তবু ভাল' সেদিন কিন্তু নিশির ডাকে' আচ্ছা ঘাবড়েছিলি। কী বলিস? আসলে কী জানিস? 'কুসংস্কার' জিনিসটা মানুষের মৌল উপকরণ, ওটা একেবারে গভীরে থাকে হয়তো, কিন্তু পুরো মাত্রায় আছে। অপর কারো মূঢ়তা আর কুসংস্কারের অন্ধ বিশ্বাস যদি সেখানটায় গিয়ে ধাককা মারে, চেতনার গভীর স্তর থেকে উঠে আসে সেই আদিম চেতনা। যার একমাত্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়।...কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলে চিনতে শিখলে ভয় কমে যায়। তোকে এতো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন জানিস? দেখলাম তোর মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হচ্ছে সরলতা আর বিশ্বাস! তোর মতন একটা সাকরেদ পেতে ইচ্ছে করে বুঝলি? মনে হয় মনের মধ্যে যে সব কথা ওঠে, কাউকে বুঝি বলে যেতে হবে।

সাগর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মত একটা কথা বলে বসে। বলে, আপনি তো খুব বড় চাকরী করতেন, সাহেবের মত শৌখিন ভাবে থাকতেন, এইভাবে থাকতে আপনার ভাল লাগে?'

একটা প্রাণখোলা উদাত্ত হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির গায়ে। সে শব্দ বাতাসে তরঙ্গিত হতে থাকে অনেকক্ষণ।

বিনয়েন্দ্র আবার একটি থাবড়া মারেন ওর পিঠে, বলেন, 'আমায় দেখে কী মনে হয তোরও ভাল লাগে না?'

না তাতো মনে হয় না।

ওকে দেখলে তো সাগরের মনে হয় একটি আনন্দের মূর্তি, কীসের এই আনন্দ? কোথা থেকে আসে এই ভাল লাগা? ভাল লাগবার

উপকরণটা কী ?···সকালবেলা ওই গামবুট আর তাল-পাতার হ্যাট পরে চাষাদের মত মাঠে কাদায় ঘুরে কাজ করা, (যেখানে বাজ্যির ব্যাং কেঁচো কেন্নো ঘুবে বেড়ায়, সাপ থাকাও আশ্চর্য্য নয়), দুপুরে চাষা-চাষীদের মতই পুকুরে ডুবে চান করা যে সাগরের এই দিদিমাদেব বাড়িতে কেউই কবে না, পুকুরের জল কেউ ছোঁয়ই না, টিউবওয়েলেই সব করে), তারপর কে যেন দয়া করে একটু রেঁধে দিয়ে যায় তাই খাওয়া, আর বিকেলে মাইল মাইল হেঁটে আদিবাসী দেহাতী, আব সাঁওতাল বস্তিতে ঘুরে ঘুরে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা, তাদেব বিনি পয়সায় ওষুধ দেওয়া আর রাত্তিরে ফিরে সেই কার যেন দিয়ে যাওয়া একটু রুটি তরকারি খেয়ে শুয়ে পড়া। এই তো অবস্থা। এ জীবন কী করে ভাল লাগে ? সত্যি চাষীদেরই তো ভাল লাগে না, তারা তাদের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠায়, যাতে তারাও ভবিষ্যতে এই মাঠে কাদায় কাজ না করে ভাল কাজ করতে পায়।···অথচ উনি—

এই ভাল লাগার উৎসটা কী ভাবতে থাকে সাগর।

সাগরের মা যে বলে সাগর হচ্ছে ভাবুক ভাবুক ওর দাদার মত লেখা-পড়ায় অতো চৌকস নয় সেটা ঠিক।

সাগরের মনেব কাছে যা কিছু নতুন আসে সাগরেব মধ্যে তার তরঙ্গ ওঠে। সাগর ভাবতে বসে তার কার্যকারণ। সাগরের মনে বড় সহজে নাড়া পড়ে।

সাহেব দাদু ওকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেবার পরে সাগব ভাবতেই থাকে।

চিনু খেতে দিয়ে ডেকে ডেকে তেড়ে আসে, এখানে এসে যে দেখছি সাপের পাঁচটা পা দেখেছিস। বেরোচ্ছিস তো একেবারে পাঁচ ঘণ্টার মত। আজ আবার, কোন নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

সাগর বিরক্ত চোখে তাকায়, যা ইচ্ছে বল কেন ? সাহেব দাদুর সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'ওমা তাই বুঝি? বলতে হয় সেকথা?' চিনু মরমে মরে যায়, ওনার সঙ্গে যে যতটুকু থাকতে পারে, তার লাভ। অমন মানুষটাকে আপন লোকেরা বুঝলো না।'

সাগর জোরালো গলায় বললো, 'তোমরা তো বোঝো।'

'আমরা বুঝলে আর কী হবে?' চিনু হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে, 'আসল লোকেরা না বুঝলে।'

'আসল নকল বলে কিছু নেই—'সাগর ঘোষণার মত করে বলে, সাহেব দাদু বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক জন্মগত সম্পর্ক, এই দিয়ে আপন পরের হিসেব হয় না। রুচি প্রকৃতির মিল অমিলই আপন পরের হিসেব। তুমি আমায় বুঝতে পারছো, তুমি আমার আপন আত্মায়, তুমি আমায় বুঝতে পারলে না, তুমি আমার পর।'

'ওমা!'

চিনু গালে হাত দেয়, 'এতো কথা কয়েছেন তোর সঙ্গে?'

'শুধু এই কথা?'

সাগর গভীর গলায় বলে, 'আরো কত কথা।'

বলেই সাবধান হয়ে যায় সাগর, আর বেশী বললেই হয়তো মা মাদুর পেতে বসে বলবে 'বোস শুনি কী কী বললেন?'

ভোলামামার কাছে গল্প টল্প শুনে এলে মা ওই রকম বিপদে ফেলতো তো সাগরকে। বলতো 'বল শুনি, কী গল্প বললো তোদের ভোলামামা।'

সাগরের ভাগ্যে তখন সাগরের দাদা এসে ঢুকলো। বললো, 'মা কী করছো? আম কাটছো? আর যাকে দেবে দাও, আমার দিও না।'

'ওমা সে কী? এই এতো ভালবেসে খাচ্ছিলি?'

'সেই তো! ভালবাসার ফল বেরোচ্ছে। আম খেয়ে খেয়ে এই কদিনেই ভুঁড়ি হয়ে গেল। আর একটুকরোও না।'

দিদিমা দালানের কোণে তোলা উনুন জেলে পরোটা ভাজছিলেন। এটা তাঁর বিশুদ্ধ ডিপার্টমেণ্ট, অপর কারো স্পর্শের অধিকার নেই।

নিজেই বেলছেন, নিজেই ভাজছেন। সাগরের মা গিয়ে একটা থালা পাতছে, দিদিমা তার উপর গরম পরোটা ফেলে ফেলে দিচ্ছেন। তরকারী রান্না করা আছে, মাছের তরকারি। দিদিমা দুপুরে স্নানের আগে রেঁধে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। মেয়েকে করতে দেন না, বলেন 'তুই এই কদিনের জন্যে এসেছিস, আর রেঁধে খাবি? পাগল না ক্ষ্যাপা...তোর দাদুব জন্যে নিয়ম করে করতে হয় না আমাব? তোর ঠাকুমার তবু একবেলা না হলে চলে, দাদুর চলে না।'

কিন্তু এই নিত্য নিয়মিত জোগানটি কে দেয়? এসব জায়গায় ঠিক নিয়মিত জোগানের বাজার নেই। একদিন খুব এলো তো, দুদিন এলোই না। তাহলে?

আর কে জোগান দেবে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অরুণেন্দ্র ছাড়া?

যেখান থেকে হোক দেবেনই এনে।

তাও দিদিমা খুঁৎখুতনী করতে ছাড়েন না।

'এতো কাঁটা মাছ আনলে? জানোই তো খাবার মধ্যে দুটি বুড়ো বুড়ি।'

অথচ একদিনও এমন কথা বলতে জানেন না, 'আজ মাছটা বেশ ভাল আছে, গরগরে রেঁধেছি, তুমি দুখানা খেয়ে যাও।'

চিনু বলেছিল ক'দিন, অরুণকাকা, এতো করেন, ও'কে তো এক আধদিন খেতে বলতে পারো মা! বৌ-মরা মানুষ, মেয়েটা কী রাঁধে কী খাওয়ায় ভগবানই জানেন।'

দিদিমা দিব্যি হেসে হেসে বলেন, আর আমিও জানি। রোজ মুসুর ডাল, রোজ আলু ভাতে, রোজ একটা করে আগডুম বাগডুম চচ্চড়ি।'

'আহা মা গো! তবে তো মাঝে মাঝে—'

দিদিমা তেমনি নির্মায়িক গলায় বলেন, 'মাঝে মাঝে একদিনে ওর দুঃখু ঘুচবে? সবাই তো বলেছিল তখন, কে তোমার সংসার দেখবে, আর একটা বিয়ে কর, তা শুনলো?'

সাগর গল্পের বই পড়তে পড়তেও শুনতে পাচ্ছিল সব কথা। সাগর বলে উঠেছিল, 'আহা তাহলেই তো ওই লতুর মত সৎমা আসবে বাড়িতে। খুব ভাল বুঝি ?'

দিদিমা মৃন্ময়ী দেবী সকৌতুকে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'লতুর বাবার পক্ষে খুব কিছু খারাপ হয়নি।'

'একজনের ভাল হলেই হবে ?'

সবাইয়ের ভাল আবার কোন ব্যবস্থায় হয়রে সাগর ? কথামালার গল্প পড়িসনি !

ওই সব কথায় নেমন্তন্নর কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। মৃন্ময়ীই আবার তুললো, 'তা বলতে গেলে অরুণকাকা মহত্ত্বই করেছিলেন, জন্মরুগ্ন বৌকে কেবল সেবাযত্নই করে মরেছেন, তবু তিনি মারা যেতে বিয়েটিয়ে করলেন না। পঞ্চাশ বছরেও লোকে বিয়ে করে। তবু যাই হোক আপনার লোকেদের উচিত একটু যত্নআত্তি করা। উনি যখন এমন প্রাণ দিয়ে করছেন।'

মৃন্ময়ী চাকি বেলুনে ঠকঠকিয়ে শব্দ তুলে হেসে হেসে বলেন, 'তা তোর ইচ্ছে হয়, তুই কর নেমন্তন্ন। বলবো চিন্নু গিন্নীবান্নী হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, চিন্নুর সাধ—'

'তা তাই ভালো।'

কিন্তু অরুণেন্দ্রর আর সে আদর-যত্ন নেবার ফুরসুৎই হয় না। কেবলই বলেন, হবে, একদিন হবে, তুই তো আছিস এখনো।

মৃন্ময়ী দেবী বলেন, 'বাদ দে ওর কথা। ও ওই রকমই। তোদের খুড়ি তো ছিল জন্মরুগ্ন, যত্ন-সেবা করেই মরেছে, যত্নের স্বাদ নিজে তো কখনো পায়নি, বরদাস্ত করতে পারে না। তারপর তো বৌ মরে গিয়ে আরো মহাপুরুষ বনে গেছে।'

'তা রান্নাটান্না তো নিজেও একটু দেখতে পারেন।'

'সে ক্ষ্যামতাই কি আছে না কি ? তাহলে রাজ্যিসুদ্ধু লোকের ব্যাগার খাটবে কে ? রাঁধে ওই পুঁটকে মেয়েটা।'

চিন্নু দুঃখের গলায় বলে, অথচ বলতে গেলে ও এ বাড়িরই লোক।'

অর্থাৎ এ-বাড়িতে থাকতে বলাটা উচিতের পর্যায়েই পড়তো।

মৃন্ময়ী সেটা অনুধাবন করেই বোধহয় বলেন, 'হ্যাঁ. ওনার ঠাকুর্দা আর আমার দাদাশ্বশুর তো সহোদর ভাই ছিলেন। তবে মুখ দেখা দেখিটা বন্ধ ছিল দুই ভাইয়ে, সেটা আমরাই খুলেছি।'

'তা বাপু আর একটু বেশী খুললেই হয়—' চিনু হেসে ওঠে, 'সংসার বলতে তো কাকা আর বারো-তেরো বছরের মেয়েটা।'

'বকিসনে চিনু। খাল কেটে কুমীর আনার শখ আমার নেই।'

চিনু মনে মনে ভাবে, মা এদিকে এতো উদার, অথচ ওই জ্ঞাতির ব্যাপারে বাপু বড় সংকীর্ণ চিত্ত। তারপর বলে, মেয়েটা কিন্তু কক্ষনো আসে না। মা-মরা মেয়ে। সরকারদের মেয়েটা পিসির আদরে তবু আছে ভাল। পাড়া বেড়িয়েই বেড়ায়। ক'দিন কিন্তু আর আসছে না।'

মৃন্ময়ী দেবী কৌটো থেকে রস-গোল্লা বার করে নাতিদের পাতে আলগাছে ফেলে দিতে দিতে বলেন, 'সরকারদের লতুর কথা বলছিস তার তো অসুখ।'

'অসুখ। কী অসুখ?'

কি জানি ওর পিসি কোন্‌খান থেকে নাকি কিসের শেকড় আনাতে যাচ্ছে, বললো নিজে থেকেই, 'লতুর যে কী হয়েছে, রাতদিন মাথার যন্ত্রণা, তাই কী নাকি শেকড় বেটে রগে লাগাবে—

'জ্বর আছে?'

'না, জ্বর হয়নি। তাহলে তো মাথার যন্ত্রণার মানে পাওয়া যেতো। কেবল শুয়ে আছে, বলে মাথা তুলতে পারছি না।'

প্রবাল গম্ভীরভাবে গেলাশের জলটা শেষ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলে 'তার মানে চোখ খারাপ হয়েছে, চশমা করাতে হবে।'

মা ছেলের চিকিৎসাবিদ্যার পরিচয়ে বিন্দুমাত্র বিগলিত না হয়ে বলে উঠলো, 'সত্যি করেই একটুও আম খেলি না? কী রে তুই।'

'বললাম তো খাব না—'

'আরে বাবা! উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে—'

'তারা মহৎ ব্যক্তি মা—'

মা ক্ষুণ্ণ গলায় বলে, 'এতো আম। তোদের জন্যে এবার তোদের দিদিমা আমবাগানের সব জমা ধরাননি। আর এই ক'দিন খেয়েই হয়ে গেল তোর? লতু মেয়েটা যখন-তখন আসছিল, এলেই আম কেটে বসিয়ে খাওয়াতাম, আহা, মা-মরা মেয়েটা। তা সেও তো আসছে না—'

সাগরের মার সকলের প্রতিই 'আহা।'

এতোক্ষণ সাহেব দাদুর ভারী ভারী কথাগুলোই মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল, তার উপর আর একটা ঢেউ এসে পড়লো।

লতু।

লতু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করে আজ তিন-চারদিন বাড়িতে পড়ে আছে আর সাগরের সেটা খেয়ালই হয়নি? ভাবছে না, যে অতো আসতো সে আসছে না কেন? সাগর অন্য চিন্তা নিয়েই মত্ত থেকেছে।

সাগর খেয়ে গিয়ে শুয়ে না পড়ে সেই জানলাটায় দাঁড়ালো গাল চেপে।...সাগর কি নীচের সেই মাঠটার দিকে তাকিয়ে আছে? যেখানে সকালবেলা সেই ক্ষ্যাপা চেহারার লোকটা বেড়ায়।

না কি সাগর নিজের মনের মধ্যেটাই দেখছে লোহার শিকে গাল চেপে।

প্রথম দিকে তো লতুকে দেখেই গা জ্বালা করেছিল সাগরের। যেদিন লতুর পিছন পিছন চলে গিয়েছিল প্রায় মন্ত্রাহতের মত, সেদিনও তো লতুব ওপর মায়াটায়া জাগেনি, বরং লতুকে নিজের থেকে বড়ই মনে হয়েছে।

তবে আজই হঠাৎ লতুর কথা ভেবে এমন মায়া হচ্ছে কেন? কেন এমন মন কেমন কেমন করছে? কেন মনে হচ্ছে ইস্ যদি এখন রাত্তির বেলা না হয়ে দিনের বেলা হতো।...

দিনের বেলা হলে সাগর ঠিক টুক করে বেরিয়ে গিয়ে সরকারদের

বাড়ির সেই দাওয়ার ওপরকার জানালাটা দিয়ে ডাকতো 'লতুদি!'

যদিও এখন আর লতুকে নিজের থেকে বড় মনে হচ্ছে না, সাগরের মায়ের মত তারও মনের মধ্যে ওই শব্দটাই ধাক্কা দিচ্ছে 'আহা, মা-মরা মেয়েটা!'

মায়ের ওই 'আহাটি'ই কি লতুকে সাগরের কাছে ছেলেমানুষ করে দিল?

তবুও সাগর 'লতুদি' বলেই ডেকে উঠবে।

সাগরের মনে হল সেটাই সভ্যতা।

সাগরের যেন হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা বোধশক্তির উন্মেষ হচ্ছে। সাগর হয়তো ক'দিন আগেও ওই সভ্যতার ধারণায় চিন্তা করতে পারতো না। সাগরের মনের মধ্যে কোনও মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার ভাল দেখানো না-দেখানোর প্রশ্ন জাগা এই প্রথম।

কিন্তু সাগরের কেন লতুর কথা মনে পড়লেই সেই ফণা তোলা সাপের মত চুল ওড়ানো হাঁপিয়ে ছুটে আসা মূর্তিটাই চোখে ভেসে ওঠে? সাগর তো আরো অনেক রকম চেহারাতেই দেখেছে লতুকে।

নীচের তলায় দালানে বসে মায়ের সঙ্গে বকবকাতে দেখেছে, বসে বসে পরিতোষ করে আম খেতে দেখেছে, গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে দিদিমার ঠাকুরঘরের ফুল এনে দিতে দেখেছে, দিদিমার রান্নাঘরে মোচা ছাড়িয়ে দিতে দেখেছে, দেখেছে শাক বেছে দিতে।

লতুকে রাস্তায় হেঁটে যেতেও দেখেছে হনহনিয়ে। একদিন তো দেখলো লতু একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ঘাড়ে করে চলেছে।

সাগর দোতলার জানলা থেকে চেঁচালো, 'গাছ কী হবে?'

লতু ঠিক শুনতে পেল না। এদিক-ওদিক চেয়ে চলে গেল।

সাগর যদি 'লতুদি' কি লতু বলে ডাক দিতো নিশ্চয় শুনতে পেতো। নিজের নামটা লোকে ঠিকই শুনতে পায় ঘুমের ঘোরেও

পায়। তা নইলে কেন সাগর নিজের মনেই গালে নিজেই একটা থাপ্পড় মেরেছিল ?

আবার সেই নিশির ডাকের চিন্তা। তোর কী হল সাগর ?

কিন্তু তারপর কী আর লতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাগরের ? তাই জিগ্যেস করবে, 'লতু অত ভারী একটা গাছের ডাল ঘাড়ে করে যাচ্ছিলে কোথায় ?'

সকাল হলেই সাগর লতুকে দেখতে যাবে আর বলবে, 'লতু সাহেব দাদুর মত মানুষের কাছাকাছি থেকেও তুমি এখনো এতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ? জানো কুসংস্কারই ভয়ের জনক। আর বলবে, হঠাৎ কী হলো তোমার ? মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারছো না ?'

ভাবনার সাগরে তলিয়ে যেতে যেতে সাগর কতো রাত্তিরে যেন ঘুমোলো।

হয়তো আর কয়েকটা বছর পরেই সাগর তার এই সরল আগ্রহী আর বিশ্বাসী মনটাকে হারিয়ে ফেলবে। সাগর তার আজকের দিনের ভাবনা ভেবে হেসে উঠবে। করুণা করবে এই বোকা ছেলেটাকে, বলবে, 'ওহে বালক ওইসব আদর্শবাদের বুলি আউড়ে আউড়েই আমাদের পূর্বতনেরা দেশটাকে পঙ্গু করে রেখেছেন। আকাশ। বাতাস। আলো মাটি এসব কথা কবিতাতেই মানায়। অথবা মানাতো। ওরা বাঁচতে জানতো না, জানতো মরতে। তাই বাঁচার শিক্ষা দিত না, মরার শিক্ষাটা দিত।'

হবেই এসব।

বয়ঃসন্ধির বয়েসটা পার হয়ে গিয়ে কঠিন ভূমিতে পা ফেললেই হবে। এখন এ-বয়সে সব কথা নতুন লাগে, সব রং আশ্চর্য লাগে।

এখন শুধু বিস্ময়।

এখন সাধারণই অসাধরণ হয়ে দেখা দেয়।

একটি মেয়ের হাসি কথা, হাতমুখ নাড়া, চোখের পাতা ফেলা,

এর মধ্যে যে এমন এক অলৌকিক আকর্ষণ লুকনো থাকতে পারে সে-কথা কি জানা যায় এ-বয়সের আগে ?

ভাললাগা যে এমন ভয়ের বস্তু তাই বা কে টের পায় এ-বয়সে পা না ফেললে ?

সাগর যেই অনুভব করছে লতুকে তার ভাল লাগছে, লতুর কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে, সেই ভয় ভয় করছে সাগরের। অন্য এক ধরনের ভয়, অপরাধবোধের মত কেমন একরকম ভয়।

এই ভয়ই বুঝি অপরাধের জনক।

সাগর যখন লতুদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে, তখন প্রবালকে দেখতে পেল। প্রবালকে এখানের পাড়ার ছেলেরা তাদের পকেট সংস্করণ লাইব্রেরীটিতে একবার পদার্পণ করতে বলেছে, কারণ, প্রবালকে তারা একজন মরুব্বি ঠাউরেছে।

প্রবাল নাকি আশ্বাস দিয়েছে সে কলকাতায় ফিরে কিছু বই জোগাড় করে পাঠিয়ে দেবে। অতএব প্রবাল এখন তাদের চোখে হীরো। ওদেরই দুজন প্রবালকে লাইব্রেরীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

সাগরকে দেখতে পেল প্রবাল, প্রবালকে সাগর। সাগর সঙ্গে সঙ্গে গতিপথ বদলালো। সরকারদের বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

প্রবাল ডেকে বললো, 'কোথায় যাচ্ছিস রে ?'

'সাহেব দাদুর বাড়ি।'

'উনি তো এখন মাঠে।'

সাগর গোঁজামিল করে কী একটা বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। সাগর সাহেব দাদুর বাড়ির কাছ পর্যন্তই চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সাগর আস্তে ফিরে এল, সেই রোয়াকটার ধারে দাঁড়ালো। কিন্তু ওর ওপর উঠে জানলায় মুখ দিয়ে লতুদি বলে ডাকা ?

ও বাবা! অসম্ভব।

অথচ রাত্রে কত সহজ আর সম্ভব মনে হচ্ছিল। তখন শুধু মনে হচ্ছিল সকালটা হওয়ার রাস্তা।

নাঃ ফিরেই যেতে হবে সাগরকে।

অথচ একটুখানি উঠে গিয়ে ওই খোলা জানলাটায় দাঁড়ালেই দেখা যাবে লতু শুয়ে আছে। মাথায় যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না লতু। তবু সাগর যখন লতুদি বলে ডেকে উঠবে, তখন নিশ্চয় লতু চোখ খুলে দেখবে, লতু উঠে চলে আসবে। বলবে, 'ওমা, সাগর তুই ?'

তা সাগরের ভাগ্যটা আজ সকালটার জন্যে অন্ততঃ সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল, তাই সাগর তার পিছন থেকে সেই একান্ত প্রার্থিত ধ্বনিটা শুনতে পেল, ওমা, সাগর তুই এখানে দাঁড়িয়ে ?'

'না না বাড়ির মধ্যে নয়, আমরা ওই লেবুতলায় বসিগে।'

বড় বড় বাতাবী লেবুর গাছে ভর্তি জায়গাটার তলার জমি যেন নিকোনো পরিষ্কার।

'পিসি এখানে ধান শুকোতে দেয়।'

বললো লতু।

তারপর সাগরের হাত ধরে টানলো, 'আয় এদিকে একটা জিনিস দেখাই—'

আচ্ছা এর আগেও কি সাগরের হাত ধরেনি লতু ? সেই প্রথম দিনেই তো পেয়ারা দিতে এসে হাত ধরে টেনেছিল 'দূর, এখন বসে বসে মহাভারত পড়ছে। যত শুয়ে থাকবি ততই পায়ের ব্যথা কমতে দেরী হবে।"

কিন্তু সেদিন স্রেফ রাগে হাড় জ্বলে গিয়েছিল। আজ অন্যরকম। আজ সাগরের সর্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুতের চমক লাগলো। সাগর অস্ফুটে বললো, 'কী ?'

'চল না দেখাচ্ছি।'

লতু ওকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলা দেখালো।

'এই যে প্লেনকরা জায়গাটা দেখছিস ? এইখানে আমার খেলাঘর ছিল ! এই যে এই ক্ষুদে উনুন দুটো এখনো তার সাক্ষী। দেখলে এখনো মনটা কেমন কেমন করে জানিস।'

সাগরের আর জানার অবস্থা।

সাগরকে সেই ভয় চেপে ধরছে।

সাগর বলে ওঠে, 'সেদিন তুমি একটা গাছের ডাল ঘাড়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে লতু ?'

'নাঃ, তুই আর আমায় দিদি বলতে পারলি না। গাছের ডাল নিয়ে আবার কোথায় যাবো ? কবে রে ?'

'সেই যে সেদিন ! যেদিন সেই কালীবাড়িতে নিয়ে গেলে—তার পরের দিন।'

'তার পরের দিন! তার পরের দিন। ···ওঃ ওঃ! আর বলিস না, পিসির কী এক শিবপূজোর ঘটা, একশো আট চক্কর ছাড়া ত্রিপত্র বিল্বপত্র চাই, কে বাবা খুঁজে খুঁজে আনবে ? গগনকে দিয়ে একটা ডাল কাটিয়ে—'

'গগন ? কে ?'

'তোদের মামাদেরই কোনো জ্ঞাতি বাবা। এই ফুলঝাঁটিতে তো সবই তোদের বামুনের ঝাড়। আমরাই আছি অভাগা কায়স্থ—'

সাগর আড়ষ্ট হয়ে বলে, 'তোমরা বামুন নয় ?

'এই ছাখো বুদ্ধুর কথা। আমরা সরকার না ?

'সরকার হলে বামুন হয় না ?'

'উঃ তোকে নিয়ে কী করবো সাগর ? তোর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লি। তা আমায় সেই গাছের ডাল ঘাড়ে করে যাওয়াটা তোর মনে পড়লো যে ?

'এমনি।'

'দেখ না গোঁয়ার্তুমীর ফলও ফলেছিল, লতু তার হাতটা তুলে দেখায় 'বেলের কাঁটা লেগে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত।'

লতু তার ডান হাতটা বিছিয়ে ধরে সাগরের সামনে।

লতুর ফর্সা ফর্সা নীটোল হৃষ্ট-পুষ্ট হাতের ওপর কাঁটার খোঁচাগুলো সত্যিই দেখতে কষ্টকর।

সাগর বলে ওঠে, 'ইস!'

'পিসির কাছে বকুনিও খেয়েছি তেমন।'

সাগরের ইচ্ছে হয় ওই হাতটায় একটু হাত বুলিয়ে নেয়, সাহসে কুলোয় না।

সাগর আস্তে বলে, 'তোমার খুব মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল? তিন-চারদিন ধরে?

লতু হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, মুখটা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, মাথার যন্ত্রনা হয়নি, আমার দুঃখ হয়েছিল, তাই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

'দুঃখু!'

'হুঁ।'

সাগর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তোমার পিসিমা বকেছিলেন বুঝি?'

'দূর পিসির বকুনি আমি এক কান দিয়ে ঢোকাই এক কান দিয়ে বার করি।'

'তবে?'

সাগর সাবধানে লতুর দিকে তাকায়।

'তুই যা করলি সেদিন। সেই জন্যেই না অত অপমান জুটলো আমার ভাগ্যে। অথচ আমি ভাবতে ভাবতে গিয়েছিলাম মাকালীর কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার প্রার্থনা জানাবো। তা নয় সব গুবলেট! দর্শন পর্যন্ত হলো না।'

সাগরের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

তবু সাগরের মনের মধ্যে ঢেউ আছড়ায়।

কী মনোবাঞ্ছা ছিল লতুর?

যা সে মা কালীকে জানাতে গিয়েছিল।

কিন্তু সেকথা কী সাহস করে জিগ্যেস করা যায়?

অথচ বোকার মত এই লেবু গাছতলায় চুপ করে বসে থাকাও তো অস্বস্তিকর।

সাগর বলে ফেলে, 'তাতে তোমার অপমান হবে কেন?'

'তা' সেটাই তো কারণ। তোকে ভয় দেখিয়েছি বলে তোর দাদা আমায় যাচ্ছেতাই করলো না?'

লতুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

এ এক ভয়ানক পরীক্ষা!

যে লতু হি হি করেই আছে, তার চোখে জল।

সাগর একটা বয়স্ক পুরুষ নয় যে, সেই পুরুষের সাহস নিয়ে ওই জলভরা চোখ মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলতে পারবে এই লতু কাঁদে না—ছি।'

সাগর একটা বালক নয় যে সেই বালকের সরল সাহস নিয়ে ওর হাত ধরে বলবে, 'এমা লতুদি কাঁদছো কেন শুধু শুধু?'

সাগরের বয়েসটা যেন দু নৌকোয় পা দিয়ে টলমল করছে। সাগর তাই প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তবু সাগর ভয়ানক একটা দুঃসাহস করে বসলো। সাগর লতুর কাঁধটা একটু ছুঁয়ে বললো, 'দাদার কথায় কিছু মনে কোরো না লতু, দাদা ওই রকম নিষ্ঠুর।'

'তাইতো দাদার হয়ে ওকালতি করতেই আছিস। আমি আর কক্ষণো তোদের বাড়ি যাবো না।'

সাগর বলে, 'আমরা তো আর ক'দিন পরেই চলে যাবো, দাদা তার আগেই যাবে।

লতু চমকে ওঠে।

বলে, 'তার আগেই যাবে?'

লতুর চমকানিটা যেন দরকারের তুলনায় অনেক বেশী মনে হয়।

লতু আবার বললো, 'আগে যাবে কেন?'

'কবে পরীক্ষা হবে জানতে পারছে না, বাবার চিঠিপত্র আসছে না—'

লতু হঠাৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলে, 'চলে যে যাবে, তা তোরা কার সঙ্গে যাবি?'

'আমরা ? আমি আর মা তো ? কার সঙ্গে আবার যাবো ? আমরা যেতে পারবো না ?'

লতু সেই জল জল চোখেই হেসে ওঠে. চিনু পিসি তো ভীরুর রাজা। আর তুই ? হি হি। তুই যা ছেলে—হি হি।

তুই যা ছেলে।

এবার অপমানের পালা সাগরের। সাগর উঠে পড়ে বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

'এই সেরেছে।'

লতু বলে ওঠে, 'রাগ হয়ে গেল বাবুর ? আচ্ছা বাবা আচ্ছা খুব একখানা সাহসী পুরুষ তুমি। এখন বোসো তো।

আবার হাতধরা।

সাগরের কি তবুও চলে যাবার ক্ষমতা থাকবে ?

'রোজ রোজ সাহেব দাতুর সঙ্গে কোথায় যাস ?'

'কত জায়গায়।'

'সেই বস্তিতে বস্তিতে তো ? ওনার রকম দেখে সবাই হাসে, বলে ক্ষ্যাপা।'

সাগর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে 'ও'কে কেউ বুঝতে পারে না।'

'সেই তো মুস্কিল। একটু উল্টো পাল্টা লোকদেরই পৃথিবীতে মুস্কিল। আচ্ছা সাগর আমায় তুই বুঝতে পারিস ?'

আচমকা এই আক্রমনে সাগর থতমত খাবেই।

সাগর তাই শুধু বলতে পারে, 'বাঃ কেন পারবো না ?'

'কি জানি। পিসি তো বলে, তোকে কেউ বুঝতে পারবে না লতি, যারা ঘরে নিয়ে যাবে, তারা পত্রপাঠ ফেরৎ দিয়ে যাবে।'

'ফেরৎ দিয়ে যাবে ? শ্বশুরবাড়ি থেকে ?'

সাগর আরো উত্তেজিত হয়।

লতু হাসে।

বলে, 'তা সবাই তো আর তোর মত নয় ? এই তো তোর দাদা। কাউকে বুঝতে চেষ্টা করবে ? ধমকেই শেষ করে দেবে।'

সাগর দাদার দুর্ব্যবহারে মরমে মরে যায়।

'লতু, মা কালীর কাছে কী প্রার্থনা করতে তুমি?'

'আর বলে কী হবে? সে আশা আর পূরণ হবে না।'

সাগরের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। কী সেই প্রার্থনা?

সাগর চুপ করে থাকে।

লতু হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে, 'বাতাবি লেবু খাবি সাগর?

'বাতাবি লেবু? ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ কেন রে? খুব মিষ্টি, এক্ষুনি খাওয়াতে পারি তোকে—'

'আমার দরকার নেই। আচ্ছা লতু মানুষ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কী সুখ পায় বল তো?'

'ওই তো মজা। জগতের সব রহস্যের সার রহস্য। অথচ ভাল ব্যবহার করতে পয়সা খরচ নেই।'

সাগর একটু থেমে বলে, 'এই দিদিমার কথাই বলি, অরুণদাদু কতো কাজ করে দেন এবাড়ির, কতো কষ্ট করেন, অথচ দিদিমা ওঁকে এতো অবজ্ঞা করেন। কী মানে বল?'

লতু সাগরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে ছোট করে হেসে বলে, ও তুই বুঝবি না—

সাগর রাগ রাগ গলায় বলে 'বুঝবো না কেন? ঠিকই বুঝি। গরীব বলেই।

তাহলে সবই বুঝেছিস। লতু বলে, 'থাক বাবা, তোকে পাকাতে চাই না। যা অবোধ তুই।'

ঠিক আছে তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী। যে যত ভালই হোক, গরীবকে, কালো কুচ্ছিৎকে হেনস্থা করবেই। কই সাহেব দাদুকে করুন দিকিন দিদিমা ওরকম! বললে তুমি বিশ্বাস করবে না পশু দিনকে রোদে পুড়ে উনি হাট থেকে কিছু ভাল আতপ চাল বয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, দিদিমা যেন মারতে উঠেছেন, আবার বাসমতী চাল এনেছো তুমি? সেদিন না বলে দিলাম, আর যেন কোনদিন না আসে।'

অরুণ দাত্থ বোঝাতে চেষ্টা করেন, দামে এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু খেতে অনেক ভালো, তাই দেখে—তা শুনছে কে ?...এদিকে কতো দিকে কত পয়সা খরচা করছেন দিদিমা, অথচ ওই চালে কী একটু বেশী পয়সা খরচা হয়েছে বলে—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না লতু, নিলেন না সে চাল। বললেন, পত্রপাঠ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাও।' ভাবতে পারো ? সেই রোদ সেই গরম আর তখুনি সেই চালের থলি নিয়ে চলে যেতে হল অরুণদাত্থকে।

একবার একটু হেসে বলতে গিয়েছিলেন, 'পত্রপাঠ চলে যাবো ? একটু বসতে ইচ্ছে করছে।' দিদিমা বলে উঠলেন, 'না না মানুষের স্বভাবই হচ্ছে বসতে পেলে শুতে চায়।'...মা বাড়ি ছিলেন না, পটাই পিসিদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন, এতো খারাপ লাগছিল আমার। মা থাকলে ঠিক বসাতেন, জলটল খাওয়াতেন।'

লতু শুনছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল।

লতুর এই ধরনটাও ভাল লাগলো না সাগরের। মানুষের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, এ দেখলে দুঃখ না হয়ে হাসি পাবে ? সাগর বললো, 'হাসছো যে ?'

'হাসছি তুই কত সরল তাই দেখে। দিদিমা এদিকে এতো ভাল, আর ওর সঙ্গেই বা কেন অমন খারাপ ব্যবহার করেন, এটা তোর মনে আসে না ?'

'আসবে না কেন ? বললামই তো গরীব বলে।'

'বেশ তাই যদি হয়, অরুণদাত্থই বা রাগে অপমানে ওঁদের বাড়িতে আসা ছেড়ে দেন না কেন ? গরীবদের তো মান অপমান জ্ঞান বেশী হয়।'

সাগর গম্ভীরভাবে বলে, 'সে উনি খুব ভদ্র বলে। ছেলেরা মেয়েদের থেকে অনেক বেশী ভদ্র হয় বুঝলে লতু !'

'বুঝলাম !'

বলে লতু একটু হাসে।

তারপর বলে ওঠে, 'তোকে একদিন বলবো।'

'তোমার সবই খালি পরে বলবো !'

'লতু সাগরের লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে বলে, 'সব কথা কি সব সময় বলা যায় !'

ওই চুলের গোড়া বেয়ে একটা তীব্র অগ্নিশিখা সাগরের শিরায় শিরায় উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। সাগর বেকুবের মত একটা কাজ করে বসে।

সাগর হঠাৎ লতুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'লতু আমি তোমায়, তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। তোমায় আমি ভালবাসি।'

লতু গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলাতেই বলে, 'ছাড়, কেউ দেখলে খারাপ ভাববে !···ভাল লাগে, ভালবাসিস সেটা এতো ঘটা করে জানাবার কী আছে ? আমিই কি তোকে ভালবাসি না ? তোকে দেখে মাত্তরই তো আমার ভাল লেগেছিল। সেটা এতো ঘটা করে জানাতে গিয়েছি কোনদিন ?'

সাগর আর এক বেকুবের মত কাজ করে।

সাগর হঠাৎ উঠে ছুটে পালিয়ে যায়।

'কী হল ? আবার আজ তোকে নিশিতে পেল নাকি ?'

সাগর চমকে তাকাল।

সাগর, বরফ সাগর হয়ে গেল।

সাগর পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়ে গেছে।

পুলিশের পরণে রং জ্বলে যাওয়া খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। মাথায় তালপাতার হ্যাট, পায়ে ভারী গামবুট।

সাগর কি এর কাছ থেকে পালাতে পারবে ?

সাগর আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না।

সাগর আত্মসমর্পণ করে। সাগর স্বীকারোক্তি করে বসে।

'আমি, আমি ভয়ানক একটা খারাপ কাজ করে এসেছি।'

এটা পূর্বের চাতাল।

এখন এখানে আর রোদ নেই।

এখানে বেঞ্চি পাতা আছে।

বিনয়েন্দ্র মাঝে মাঝে এসে বসেন। আস্ত একখানা বাড়, একটা মাত্র লোক কতটাই বা ভোগ করতে পারে?

তবু বসেন বিনয়েন্দ্র এখানে সেখানে।

কেউ সামনে থাকলে বলেন, 'এই খানে বসে আমার দাদু তেল মাখতেন। এইখানে পিসিমা রোদে পিঠ পুড়িয়ে বড়ি দিতেন।'

'বোস এখানে!'

বললেন বিনয়েন্দ্র, 'এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে না।'

তারপর বললেন, এইখানে বসে আমরা—আমি আর আমার কাকা দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করতাম।

সাগর শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো।

বিনয়েন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে ওই মাথা হেঁট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলেন,'ভালবাসাটা খারাপ কাজ এটা তোকে কে বললে? যাকে ইচ্ছে ভালবাসতে পারো তুমি। তবে হ্যাঁ ব্যাপারটাকে খানিকটা বোকামী বলতে পারা যায়। তবে সাংঘাতিক বোকামী হচ্ছে আড়ম্বর করে সেটা বলতে বসা। কী দরকার বলতে যাবার? তুমি যদি কাউকে সত্যি ভালোবাসো সেটা কি সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না বললে বুঝতে পারবে না?···এই যে তুই আমায় ভালবাসিস ভক্তি ছেদ্দা করিস, ক'দিনই বা দেখেছিস, তবু করিস, এ কি আমি বুঝতে পারি না, না পারছি না? আমায় তুই বলতে এসেছিলি? না না হাসিস না, সত্যি ভালবাসা সব সময় এরকম। তুমি বাসলেই সে জানতে পারবে। কিন্তু দেখ ডেকে হেঁকে বলতে যাওয়ার কী বিপদ। নতুর মত মেয়ে সংসারে দুর্লভ। ওকে কে না ভালবেসে থাকতে পারে?'

আবার একটু হাসেন বিনয়েন্দ্র, 'আমার তো মনে হয়, ও যদি ওর সৎমার কাছে গিয়ে থাকতো সেও ভালবাসতে বাধ্য হত। ওকে যদি তোর ভালবাসতে ইচ্ছে যায় সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু যে মুহূর্তে তুই মুখ ফসকে বলে বসলি, সেই মুহূর্তে তোর কী দশা

হলো বল ?···স্রেফ চুরি ধরা পড়ে যাবার মত ছুট মেরে পালিয়ে এলি। আর এরপর কী হবে? ওই লতুর সামনে মুখ তুলতে পারবি না। ওকে দেখলেই ছুট মারতে ইচ্ছে করবে। অতএব তুমি এরপর থেকে ওকে অ্যাভয়েড করে চলবে! তাহলে বল? লাভটা কী হল তোমার? ভালবাসাটি জাহির করে বলতে গিয়ে তুমি ভালভাসার পাত্রটিকে হারালে।

সাগরের হেঁট মুণ্ডের অন্তরালে কী ঘটতে থাকে কে জানে।

বিনয়েন্দ্র সেদিকে তাকিয়ে দেখেন না।

হয়তো ইচ্ছে করেই দেখেন না।

একটুক্ষণ পায়চারী করে বেড়িয়ে সরে এসে বলেন, 'তোর মত ছেলেদের জন্যেই ভাবনা বেশী। তোদেরই বিপদের সম্ভাবনা। পলিটিকস তোদেরই চিবিয়ে খায়।······যাক আমি তোকে বলে দিচ্ছি একথা ভাবিস না, 'কদিন পরেই তো চলে যাবো, এ কটা দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেব, আর ওর ছায়া মাড়াচ্ছি না। সেটা অন্যায় হবে। সেটাই খারাপ কাজ হবে। লতুর সঙ্গে দেখাটেখা করবি। যেমন সহজভাবে কথা বলতিস, বলবি। তবে দেখিস বাবা, আবার যেন ঘটা করে ক্ষমাটমা চাইতে যাসনে। ও মেয়ে তাহলে তোকে চাঁটি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। মহা জাঁহাবাজ মেয়ে।'

বলে হাহা করে হেসে ওঠেন বিনয়েন্দ্র।

যে হাসিতে সমস্ত পরিবেশটা নির্মল হয়ে ওঠে।

লাইব্রেরী থেকে ফেরার সময় প্রবালের সঙ্গের ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠলো, প্রবালদা, একটু দাঁড়ান, আমাদের লাইব্রেরীর আর একটি পাণ্ডার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। এই যে লতুদি—

লতুর হাতে একগোছা লম্বা কঞ্চি, লতু গম্ভীরভাবে ফিরে তাকায়।

'প্রবালদা আজ আমাদের লাইব্রেরী দেখতে গিয়েছিলেন লতুদি—

লতু কঞ্চি সমেত হাতটাই একটু জোড় করতে চেষ্টা করলো।'

প্রবাল মুচকি হেসে বললো, 'ইনি সেক্রেটারী ?'

'না-না সে কী, সেক্রেটারীর সঙ্গে যে এইমাত্র আলাপ করিয়ে দিলাম।...ইনি মানে লতুদি, আমাদের খুব সাহায্য টাহায্য করেন। বই গুছিয়ে দেন, লিস্ট করে সাজিয়ে দেন—'

লতু গম্ভীরভাবে বলে থেমে যাচ্ছিস কেন? সবগুলো বল। বইয়ের ধূলো ঝেড়ে দেন ঘর ঝাড়ু দিয়ে দেন—

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে বলে, 'আঃ কী যে বল লতুদি ?'

লতু ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন কিছু বাড়িয়ে বলেছি ? করি না এসব তোদের ফুলঝাঁটি আদর্শ লাইব্রেরীর নিজস্ব একটা ঝাড়ু আছে ?

প্রবাল তেমনিভাবে হেসে বলে 'তাতে কী ? সেটা গ্রামের মেয়েদের হাতে থাকলেই হলো ।'

লতু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে, আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তো ?

ছেলেটা থতমত খেয়ে বলে, 'হ্যাঁ ইয়ে, প্রবালদা তো এইসামনের সোমবার পর্যন্ত থাকছেন।...কঞ্চি কী হবে লতুদি ?'

'বেড়া দেব।'

বলে গটগটিয়ে চলে যায় লতু।

লতু মনে মনে বলে 'মানুষ কেন মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে জানিস সাগর ? মনে করে ওটাই বাহাদুরী।'

তারপর আবার বলে, 'তোরা দুটো ভাই-ই বুদ্ধু। চিনুপিসি অবিশ্যি বোকাসোকা ভালমানুষ কিন্তু তোদের মত বুদ্ধু নয়।...তুই আজ কা বিদ-ঘুটে কাণ্ডই করে বসলি বল তো ?...যা বললি তা বললি, অমন করে পালালি কেন ? আমি তোকে মেরেছি ? বকেছি ? কিছু বলেছি ?' দূর মেজাজটাই বিগড়ে দিয়ে গেলি।...আর তোর ওই বোকামির ফলে আমায় এখান ওখান ঘুরে কঞ্চি খুঁজে বেড়িয়ে দেরী করতে হলো।...কি জানি বাবা আবার তোর ওই ভয়ে ছুট মারা অবস্থার সঙ্গে আমায় যদি কেউ দেখে নির্ঘাৎ ভাববে তোকে একলা পেলেই আমি শাঁকচুণী মূর্তি ধারণ করে ভয় দেখাই। আরো

কত কীই ভাবতে পারে—লোকের তো ভাবার গাছ পাথর নেই। মহৎ মহৎ ব্যক্তিদের নিয়েই ভাবছে, অধমদের কথা ছার···তোর দাদা যদি দেখতো নির্ঘাৎ আমায় ফাঁসিতে লটকাতে আসতো। এই যে এখন? কী দরকার ছিল প্রবালবাবু তোমার আমার মতন একটা তুচ্ছ মেয়েকে ব্যঙ্গ করতে আসার?···মেধো বলেছে—আমি লাইব্রেরীর সেকেটারী। অবিশ্যি তা হলেও আমার কিছু মান বাড়তো না। ভারী তো লাইব্রেরী, তার আবার সেক্রেটারী। যেমন বিয়ে তেমনি বাজন্দর। হুঁঃ। লাইব্রেরীতে প্রবালদার পায়ের ধুলো পড়ায় ধন্য হয়ে গেল লাইব্রেরী।' যতোক্ষণ না বাড়ি ঢোকে মনে মনে কথা বলে যায় লতু।

কিন্তু প্রবাল বলে ছেলেটা?

লতুর ব্যবহারে সে নিজেকে অপদস্থ মনে করে কেন?

এর আগেও লতুকে ধমকানোর দিন নিজেকে অপ্রতিভ মনে হয়েছিল। এই একটা দারুণ দোষ আছে মেয়েটার। আর একদিন সুযোগ পাই তো এর শোধ নিই।

কিন্তু দোষটা কী ধরণের সেটাই ঠিক করতে পারে না প্রবাল।

আচ্ছা করে কড়কে দেবে?

না, খুব ভদ্র ব্যবহার করবে?

'তুমি কি পড়? তোমার কী সাবজেক্ট ছিল? এরপর আর পড়তে ইচ্ছে করে কিনা, শিউড়িতে তো কলেজ আছে-আর তোমার বাবাও শুনেছি সেখানে আছেন তবে কলেজে পড়লে না কেন? এসব জিগ্যেস করলেও মন্দ হয় না।···

আমাকে খুব অভদ্র আর রাফ ভেবে রেখে দিয়েছে তো। ধারণা বদলে যাবে।

সুযোগটা কবে কখন কোথায় পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে কথা।

এখানে অবিশ্যি সুযোগের খুব একটা অভাব নেই। মেয়েগুলো

তো পাড়া বেড়ানি। আর কতো অগাধ জায়গা আছে। মাঠ নদীর ধার মন্দির-টন্দির…ওই সাহেব দাত্বর বাড়িতেও তো হরদম যায়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আর তেমন আলাপ করা হচ্ছে না। উনি নাকি এরপর পোলট্রি করবেন। দেশের লোকেরা এখন আর ভাল করে খেতে পায় না, অথচ গরু পোষাও ব্যয় সাপেক্ষ, তাই ঘরে ঘরে পোলট্রি করবার পরিকল্পনা ওঁর আছে। কম খরচে তবু একটা পুষ্টিকর জিনিস খেতে পাবে লোকে।…গ্রাম সম্বন্ধে খুব ভাবেন উনি। আদর্শ আছে। হবে পারা শক্ত। আমরা পারবো গ্রামে এসে গ্রাম উন্নয়ন করতে?…ফুলঝাটির এই বিষয় সম্পত্তির মালিক তো শেষ পর্যন্ত আমাদের মা শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী। এটা নিয়ে পরীক্ষা করা অসম্ভব নয়!…কিন্তু অসম্ভব। আদর্শ পাগল লোক ছাড়া কেউ পারে না এসব।

ছেলে ছুটো কোথায় যে ঘুরছে।

চিনু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, পটেশ্বরী ঢুকলেন একবাটি মালপো হাতে নিয়ে। বেশ বড় জামবাটি একটি।

বাটিটা চিনুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন,'কই গো, আমার বাকয়া কই?'

চিনু হেসে ফেলে বলে, 'আমিও জানি না। তা এত কী হবে গো পিসি?'

'কী আবার হবে?' খাবি মায়ে পোয়ে। ছোঁড়ারা এসেছে পর্যন্ত ভাবছি হাতে করে একটু খাবার তৈরী করে নিয়ে যাই, তা আর হয়ে উঠছে না। হবে কি, বাড়তি ছুধ চাইলে গয়লায় দিতে পারে না। ফুলঝাটিতেও এখন ছুধের আকাল। বোঝ? এই আমরাই একদা মাকে লুকিয়ে গেলাশ গেলাশ ছুধ গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েছি। আর ভালমানুষী মুখ করে বলেছি—খেয়েছি সবটা। …আর এখন? ছুধের বাছারাই ছুধ পাচ্ছে না। আমার এই জীবদ্দশাতেই এই ফুলঝাটির কত রূপান্তরই দেখলাম।……যাকগে,

সেসব কথা তুললে এখন মহাভাবত। তা আমাব বর দুটো কোথায় গেল?'

চিন্নু হেসে ফেলে বলে, 'বর দুটো? আমাব দুটো ছেলে একটা বৌ?'

'তাতে কী, বাতদিন তো তোব মা মহা-ভাবত নিয়েই আছে, তাতে এর অধিক উদাহবণ নেই?'

চিন্নু হাসে।

বলে, দুটোব একটাও বাড়ি নেই। এসে পর্যন্ত তো টিকি দেখা যাচ্ছে না কাকব। আসাব আগে পাড়াগাঁ বলে কত ভয়-ভাবনা, এসে তো দেখছি—'

'হুঁ। ওটা এই ফুলঝাঁটিব মাটির গুণে বে চিন্নু। এ মাটিতে পা দিলেই ভালবাসা জন্মায়।'

চিন্নু হেসে বলে, 'কই আব?' সকল বাড়িই তো ফর্সা। বৌরা তো সব 'ভাগ'বা। বেশীব ভাগ বাড়িতেই তো দুটো একটা করে বুড়ো বুড়ি ভিটে আগলে পড়ে আছে। আব ওই ডেলি প্যাসেঞ্জাব কটা যা সংসার কবছে।...'

পটেশ্বরী একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন 'তা যা বলেছিস। কী বমবমাই ছিল দেশে। বাড়িবাড়ি গোলা, মরাই, গোয়াল গরু—।

হঠাৎ হেসে ওঠেন।

বলেন, 'সেই যে বলে না রাখালী কত খেলাই দেখালি।' তা মা সাধক কালী দেখাচ্ছেন বটে খেলা।... ..মাকে দেখতে গিয়েছিল চিন্নু?'

'কই আর হলো?'

চিন্নু বলে, 'তুমি একদিন সময় করে নিয়ে চল না?'

'তা তাই যাবো। তোর মা তো আবার একরকম। না হিন্দু না খ্রীষ্টান। এদিকে আচার বিচার পুজো পাঠ রামায়ণ মহাভারত সব, অথচ দেব মন্দিরের দিকে পা বাড়াবে না। বাড়ির চৌকাঠই

পার হতে চায় না। যাবো আমিই নিয়ে যাব। আছিস তো কদিন ?

'আমি আছি মাস কাবার পর্যন্ত।·· বড় ছেলে কাল চলে যাচ্ছে'।

'এই ভাখো। কাল চলে যাচ্ছে ? খুব ভাগ্যিস খাবারটাকে নিয়ে এলাম আজ। তা ও আগে যাচ্ছে কেন ?'

'আর বল কেন পিসি। ওই এক এক-বগ্‌গা ছেলে। যাবো বললো তো যাবোই। পরীক্ষা পরীক্ষা বাই চেগেছে এখন। পোড়ারমুখো পরীক্ষাও কি তেমনি ? ঝুলিয়ে রেখেছে দু মাস।······ আগে কখনো এমন দেখিনি বাবা। এসব একেবারে চন্দ্র সূর্য্যের নিয়মের মত ছিল।

'এখন সবই বদলাচ্ছে। সবই একেবারে উল্টো অবতার। নেহাৎ মানুষ জাতটা এখনো পাটা ওপর দিকে আর···মাথাটা নিচের দিকে করে হাঁটছে না। ··আরও বাঁচলে হয়তো তাও দেখে যাবো। তোদের শহর বাজারে তো শুনেছি হিপি না টিপি কী হয়েছে, তা তারাই এ ফ্যাসান আনবে।'

চিনু হাসতে থাকে।

বলে 'পটাই পিসির এক কথা।'

পটেশ্বরী আঁচল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলেন, বলি কি আর সাধে লো সই, বলি কি সাধে ? দেখেশুনে প্রাণপাখী ডাক ছাড়িয়া কাঁদে! তা দুম করে একটা কথা তোকে বলে ফেলছি চিনু। শুনে গায়ে ধুলো দিস তো সে ধুলো মেখেই চলে যাবো।

চিনু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়'

পটেশ্বরী আঁচল ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, বলে ফেলছি তাহলে —বলি এখন তো সবই উল্টো পুরাণ, তোদের কলকেতায় তো এখন শুনি জাতের বিচার লোপ পেয়েছে। বামুন কায়েত তো দূরের কথা হাড়িবাগদীতেও হচ্ছে। তা তুই কেন নে না একটা কায়েতের মেয়ে ?" বড় ছেলের বিয়ে তো দিবি আজ বাদে কাল।'

চিনু অবাক হয়ে তাকায়।

'প্রবালের বিয়ের কথা বলছো ?'

'তবে না তো কী ? তবে আজকেই কি আর দিতে বলছি ? বলে কয়ে রাখতিস।'

চিনু একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

চিনু বলে, লতুব কথা বলছো ?'

'যাক বুঝেছিস তাহলে ?'

চিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'সে কি আব তোমার জামাই রাজী হবে ?'

'হবে না ? কেন, জামাই খুব গোঁড়া বুঝি ?

'না না তা' নয়। তবু—'

পটেশ্বরী বলেন বুঝেছি। আর বলতে হবে না। ওই তবু আর কিন্তু এরাই রাজ্য চালাচ্ছে। মেয়েটা বড় ভাল রে চিনু। তোর ছেলের গুণাগুণ আমি জানি না। তোর কথা ভেবেই বলছিলাম। কি জানি কোথায় গিয়ে পড়বে, কোন শাসনের তলায় পেষাই হবে। তোর মতন একটি শাশুড়ী কি আর জুটবে ?'

চিনু অপ্রতিভ মুখে বলে, আজ-কাল আর সেই আগের মতন বৌ-কাটকী শাশুড়ী নেই পিসি !'

পটেশ্বরী বলেন, 'ওই শুনতেই নেই লো চিনু। সবই ঠিক আছে। এখন তোদের কালে সোজায় কাটে না, উল্টো প্যাঁচে কাটে।'

'পিসি রাগ টাগ কোরো না।'

'আরে দূর মেয়ে। আমি কি আর সত্যি পিত্যেস নিয়ে বলেছি ? ভাবলাম বলেই দেখি ভগবান কখন কোন কথা কানে শোনেন। মেয়েটার জন্যে মনটা বড় কাঁদে।···ওমা এই যে আমার একটি বর এলেন। একেই বলে মনের টান। আমাদের একটা গোয়ালা ছিল, বলতো, মনের টানে জরু আর রশির টানে, গরু। তা কালই গোকুল ছেড়ে

প্রবাল নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'মানে বুঝলাম না।'

'মানেই বুঝলি না ? চিন্নু তোর বিদ্বান ছেলে বলে কী ? এসব তোদের পড়ার বইতে থাকে না বুঝি ? তা একটু 'মালপো' থাকলো খেও ভাই ! বুড়ি বলে ঘেন্না করে যেন ফেলে দিও না।'

বিনয়েন্দ্র বলেন, না বললেই পারতিস পটাই !

পটেশ্বরী বলেন, 'ভাবলাম, বলেই ফেলি ধাঁ করে। যা হয়। না হলে না হলো, আমার মানের কানা তাতে খসে যাবে না।'

'মৃন্ময়ী বৌদি শুনলে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

'হলে ভাতের চাল দুটি বেশী নেবেন। পটেশ্বরী কারো সন্তোষ অসন্তোষের ধার ধারে না।'

বিনয়েন্দ্র সকৌতুকে বলেন, 'সাত জন্মে তো কখনো শ্বশুরঘর করলি না। তাই ঘোড়ায় রাশ পরানোই হল না।'

কিন্তু বাপের বাড়িতেই কি আর রাশ টানার কথা ওঠে না ?

লতুর কাকা দিদিকে বলে, তোমাকে আর কী বলবো দিদি, তোমার অবস্থা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত। স্নেহান্ধ তবু দাদা এখানে নেই, আমার বলা কর্তব্য বলেই বলছি—মেয়েকে একটু রাশ টেনো। অনবরত মেয়ে রাস্তায় ধিঙ্গী নাচ নেচে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরীতে ফাংশান হবে তাতে তোর কী ? আর চিন্নুর এই ছোট ছেলেটা, লম্বায় তো আমার জ্যেঠামশাই, সেটার সঙ্গে এতো কী ?'

লতুর পিসিও ভাইয়ের দিদি।

তিনি তেমনি চড়া গলায় বলেন, 'তো তোর যদি চোখে ঠেকে থাকে তো মান্য করছিস না কেন ?'

'আমি মানা করার কে ?'

'ওঃ ! বাপকাকায় শাসন করবে না, পাড়ার লোক এসে শাসন করবে ? মেয়ে বেচাল হলে এই সরকার বংশেরই মুখ পুড়বে, আমার শ্বশুরের বংশের নয়।'

'বেচাল হলে ? হতে বাকি আছে ?'

কাকা চড়া গলায় বলে এই তো দেখলাম খান ডোবা পেরিয়ে

কাঁটাবন ডিঙ্গিয়ে ইস্টিশানের মুখে কোথায় চলেছে, চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'যাচ্ছিস কোথায় ? তা শুনতেই পেলেন না রাজ-কন্যে।'

পিসি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ইষ্টিশানে যাবার জন্যে খানা ডোবা ডিঙোতে যাবে কেন ? পাকা সড়ক কী দোষ করলো ?'

'খোদা জানে।'

'তার মানে ইষ্টিশানে যাচ্ছে না। ওর সেই বন্ধু মৌটুসীর কাছে যাচ্ছে।

'শাক দিয়ে মাছ ঢেকে ঢেকে তুমি মেয়েটার ইহ-পরকাল খেলে দিদি।'

বলে কাকা হনহনিয়ে চলে যায়।

তা অভিযোগটা মিথ্যে নয়।

এরকম শাক দিয়ে মাছ ঢেকেই থাকেন পিসি। তবে তিনি তখন নিজে ভাবতে বসেন, তখন বলেন, 'বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি ওর দ্বারা কোনো মন্দ কাজ হবে না। তাই আমার এতো নিশ্চিন্ততা।'

অথচ যে কাজটা করতে খানা ডোবা ডিঙিয়ে শর্টকাট করছিল লতু, জগতের চোখে সেটা এমন কিছু ভাল নয়।

এই যে তুমি পায়ে হেঁটে সাইকেল রিকশাকে ছাড়িয়ে আগে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়ে, সেটা কী বেশ শোভন হলো ? তোমার বাপ দাদা কেউ রওনা দিচ্ছে ? তাই তুমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলে ?...আর ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরও উদাস নয়ন মেলে আকাশে ছড়িয়ে পড়া ইঞ্জিনের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইলে।

রইলে তো রইলেই।

আর রইলে বলেই না লম্বায় তোমার কাকার জ্যেঠামশাইয়ের মত ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর সাগরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে দাঁড়িয়েই চমকে গেল।

'লতু তুমি এখানে ?'

'হুঁ। আমার চেনা একজন কলকাতায় গেল তাই—'

'এই দেখো! দাদাও তো গেল এই ট্রেনে।'

হুঁ দেখলাম। সাইকেল রিক্‌শা চেপে এল। কই তোকে তো দেখলাম না?'

'দাদার খেয়ে টেয়ে নিতে দেরী হয়ে যাবে বলে, দিদিমা আমায় আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন টিকিট কেটে রাখতে—'

'তুই পারলি?'

'একটা টিকিট কেটে রাখতে পারবো না? তুমি আমায় কী ভাবো লতু?'

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিনের কথা মনে পড়ে যায় সাগরের।

যদিও সাহেব দাদু বলেছিলেন, পালিয়ে পালিয়ে বেড়িও না, লতুর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দেখাটেখা কোরো কথা বোলো, কিন্তু সে সাধ্য হয়নি সাগরের।

সাগর মনকে চোখ ঠেরেছিল, আমি তো আর পালিয়ে বেড়াচ্ছি না, অ্যাভয়েডও করছি না. দেখা না হয়ে গেলে কী করবো? বাড়ি গিয়ে খুঁজতে যাবো? অনেক ঝামেলা তাতে। সেদিন ওদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওর সেই কাকা। তুমিই চিনুদির ছোট ছেলে না? বলে এমনভাবে তাকালেন, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মার বাপের বাড়ির দেশে এসে পর্যন্ত কী যে এক ভয় ঢুকেছে। ভয়ে ভয়েই হার্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ভয় মানেই সাহসের অভাব।

লতুকে খোঁজ করে স্বাভাবিক হবার সাহস হয়নি সাগরের। ...কিন্তু এখন হঠাৎ প্লাটফরমের ধারে কাঠচাঁপা গাছটার তলায় লতুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাগরের আহ্লাদের সাগর উথলে উঠলো।

সাগর বললো, 'এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবে?'

'নাঃ ইচ্ছে করছে না। আয় না ওদিকে ওই গাছতলাটায় গিয়ে বসি। বেশ বাঁধিয়ে রেখেছে, বসবার স্থবিধে আছে।'

সাগর কৃতার্থ হয়ে যায়।

সাগর চোখ তুলে তাকায়।

সাগব তবু না বলে পারে না,'দেরী হলে বাড়িতে বকবে না তো?'

বকুক গে। বকুনির ভয়ে কেঁচো কোন্নার মত গুটিয়ে গুটিয়ে জীবন কাটালেই কি তুই বকুনির হাত থেকে রেহাই পাবি?...না তোর কথা বলছি না, তোদেব ছেলেদের তো সাতখুন মাপ। গোঁফ গজালেই আর কেউ বকতে সাহস পায় না। যত জ্বালা মেয়ে মানুষেব।...আমি বাবা ঠিক করে রেখেছি কত বকবে বকো। আমি নিজে অন্যায অপকম্ম না করলেই হলো।'

সাগব আডমাদলার মত বলে ফেলে, 'আমি সেদিন খুব খারাপ কাজ কবে ফেললাম।'

'তা করেছিলি।'

বললে লতু উদাসভাবে।

সাগরেব মুখ শুকিয়ে চুন।

সাগর মনের চাঞ্চল্য সংহত করতে আঙ্গুলগুলো নিয়ে মটকাতে শুরু কবে।

লতু একটু পরে বলে, 'তোর ওই পালিয়ে যাওয়াটা খুব খারাপ কাজ হয়েছিল। আমি তোকে গালে ঠাশ করে চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম? ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম?

সাগর আরও জোরে আঙ্গুল মটকাতে থাকে।

লতু ওর হাতটা টেনে ধরে ছাড়িয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, 'আঙ্গুল মটকাসনে। কেউ দেখলে ভাববে তুই কাউকে শাপমুক্তি দিচ্ছিস। কি রে তোর আঙ্গুলগুলো যে কাঁপছে।'

'লতু তুমি আমার হাত ধরো না।'

'কেন?'

'আমার, আমার কী রকম যেন হয় ভয় করে আবার হয়তো সেদিনের মত—'

লতু ওর হাতটা আরো শক্ত করে চেপে রেখে বলে, 'এই খোলা প্লাটফরমে সেদিনের মতন লতু তোমায় আমি ভালবাসি বলে জড়িয়ে ধরলে তোকে তো পুলিশে ধরবে। তুই এতোটুকু ছেলে, তোর এতো কেন ?...বাসলেই বা ভালো, 'দিদি, বলে ভালবাসতে পারিস না ?'

সাগর হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিয়ে উদ্ধত গলায় বলে, 'না। তুমি আমার থেকে মোটে আট মাসের বড়।'

'তার মানে তুই আমার থেকে আট মাসের মাত্তর ছোট। আমি তো বেশ নিজেকে তোর দিদি দিদি ভাবতে পারছি।'

সাগর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না।

লতু একটু হেসে বলে, 'ওঃ বাবুর মানের হানি হলো।...তবে বলি সাগর, সেদিনই বলতাম, বলবো বলেই লেবুতলায় নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলাম। তা তুই তো সব গুবলেট করে দিলি। তোকে ভালবাসতে আমার এতো ভাল লাগে কেন জানিস, তুই প্রবালদার ভাই বলে।'

সাগর চমকে তাকায়।

সাগরের মুখটা বোকার মত দেখতে লাগে।

লতু সামনের ফাঁকা রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে অন্যমনা গলায় বলে, 'সেদিন মা কালীর কাছে কী মানত করতে গিয়েছিলাম জানিস ? প্রবালদা যেন আমার সঙ্গে একটু ভালভাবে কথা কয়।'

সাগরের ঠোঁটদুটো কাঁপে।

সাগরের আঙুলগুলোও আবার কাঁপে।

সাগর তবু সেই হাতটা বাড়িয়ে নিজে থেকেই লতুর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'ওঠো লতুদি !'

যাক্। 'তাহলে বুঝতে পারলি ?'

লতু বললো, 'ভালবাসার কথাই শিখেছিস পাকার মত, ভাল-

বাসার মুখ চিনতে শিখিসনি। তোর যদি বুদ্ধি থাকতো, প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারতিস।'

'আমি বুঝতে পারিনি, সত্যিই বুঝতে পারিনি লতুদি!'

'এখন তো পারলি?'

লতু একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার মরণের কপাল, তাই প্রবালদা প্রথম দিন থেকেই আমায় অগ্রাহ্য করেছে আর প্রথম দিন থেকেই ওর জন্যে মরছি।...ইচ্ছে হতো একবার দুটো কথা কইবার সুযোগ পেলে বলে নিই, আমি তো বাপু তোমায় বিয়ে করতেও চাইছি না, তোমায় নিয়ে পালাতেও চাইছি না, শুধু একটু ভাল করে ডেকে কথা বললে, কি হাসলে গল্প করলে, এতে কিছু আর তোমার জাত যাবে না। তবু আমার মনেব মধ্যে একটা ভালবাসা সুখ থাকতো। ওই সুখটা কৌটোয় ভরে তুলে রাখবো, যেদিন জগৎ সংসারের ব্যাপারে মনটা দুঃখু দুঃখু হয়ে যাবে, কৌটো খুলে ওই সুখটি বার করে দেখবো!'

'লতুদি, তুমি এই বয়সে এতো কথা ভাবো কী করে?'

লতু হেসে ওঠে।

'বলে ভাবাই আমার ব্যাধি। ভেবে ভেবেই আমি ভালবাসার মুখ চিনতে শিখেছি, বুঝলি? তুইও যদি ভাবতে শিখিস, দেখতে পাবি, যে যাকে ভালবাসে, তাকে দেখলেই তার মুখে একটা আলো জ্বলে ওঠে। যেন ভেতরে কে ইলেকট্রিকের সুইচ টিপে দিল।'

'এরকম তুমি কখনো দেখেছো লতুদি?

লতু মাথাটা কাৎ করে বলে, না দেখলে আর বুঝবো কী করে?'

'কই? কোথায়? কবে?'

'এখানেই দেখছি, রোজই দেখছি। তুইও দেখছিস।...পটাই ঠাকুমা যখন সাহেব দাদুর ভাত নিয়ে এসে কাছে বসেন, তাকিয়ে দেখিস।'

সাগর চমকে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলে।

লতুর ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে।

লতুর কপালের ওপর ঝুরো চুল-গুলো খোলা হাওয়ায় ছুলছে। …সাপের মত নয়, লাউ ডগার কচি পাতার মত।

লতুর মুখে মৃদু হাসি।

'শুধু কি আর আমিই বুঝতে শিখেছি রে? সংসার শুদ্ধু লোক বুঝে বুঝে পাকা। মেয়েমানুষের চোখে এ আলো ধরা পড়বেই! তবে পাকা লোকেরা পচা পচা কথা বলে, এই যা দুঃখু। আমার ভারী ভাল লাগে জানিস।…আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি ওই আলোটার দিকে।…যতো আলো সাহেব দাদুর মুখে, তত আলো পটাই দিদিমার মুখে—'

সাহেব দাদু! পটাই ঠাকুমা!

সাগরের একথা অবিশ্বাস লাগে।

সাগর বলেই ফেলে, ধ্যেৎ। ওঁরা তো বুড়ো!'

লতু ওর কাঁধে একটু ঠেলা মেরে বলে, সাধে বলি তুই একটা বুদ্ধু! বুড়ো তা কী? বুড়ো হলে ভালবাসা ফুরিয়ে যায়?… চিরদিনই তো মানুষ ভালবাসতে বাসতেই পৃথিবীতে এগোচ্ছে! বুড়ো হলে মাতৃস্নেহ থাকে না? বন্ধুর ভালবাসা থাকে না? তবে? এটাই বা ফুরিয়ে যাবে কেন? বরং তো আরোই বাড়বে। যতোই পৃথিবীর অন্য সব কাজ কমে আসবে, ততোই এই ভাল-বাসাটাকেই আঁকড়ে ধরবে।'

একটা মালগাড়ি এলো।

থামলো না।

শনশন করে চলে গেল। তবু কিছুক্ষণের জন্যে প্লাটফরমটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ।

সাগরের মনের মধ্যে আবার সেই উত্তাল ঢেউ আছড়াচ্ছে।

লতু যেন আস্তে আস্তে সাগরের চোখের সামনে একটা অজানা রহস্যের দরজা খুলে দিচ্ছে।…এরপর হয়তো সাগর ভালবাসার মুখ চিনতে পারবে।…সাগর তেমন দেখতে পেলে বুঝতে পারবে

মুখের নীচে চামড়ার তলায় কে যেন একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে দিল ওদের।

অনেকক্ষণ পরে লতু আবার বললো, 'তুই সেদিন বলেছিলি মনে আছে, 'সাহেব দাহু কোনোদিন সন্ন্যেসী হয়ে কোথাও চলে যাবে। আমি হেসেছিলাম মনে আছে?'

সাগর মাথা নেড়ে সায় দেয়।

লতু আস্তে বলে, 'আমি বললাম, সন্ন্যেসী তো হয়েই আছেন, নতুন আর কি হবেন?...তবে চলে কোথাও যাবেন না, দেখিস? ...লতু পটেশ্বরীর মত আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'তুই বললি, কেন যাবেন না? আমি বললাম পরে বলবো—'

'তুমি তো সব কথাই 'পরে বলবো' বলে ঠেলে রাখো লতুদি!'

লতুদি।

আশ্চর্য! এখন কত সহজেই 'লতুদি' বলতে পারছে সাগর। বলতে ইচ্ছেই করছে।...যেন এখন সাগর লতুকে স্বস্তি করে ভালবাসতে পারবে নির্ভয়ে।

লতু বলে, 'ঠেলে রাখি কি সাধে। তুই যে নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ! কেন যাবেন না জানিস? ওঁর ওই ক্ষেত খামারের জন্যেও নয়, আর সাওঁতাল বস্তির ভক্তদের জন্যেও নয়, পারবেন না স্রেফ ওই পটাই ঠাকুমার জন্যে।'

'ধ্যৎ! এ তুমি কল্পনা করে করে বলছো লতুদি—'

'কল্পনা করে করেই মানুষ জগতের সকল রহস্য উদ্ধার করে সাগর। পড়িসনি সেই পদ্যটা? হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা। ভ্রমর ফিরেছে মাধবী কুঞ্জে তরুরে ঘিরেছে লতা।'

সাগর মাথা নেড়ে বলে, 'পড়েছি।'

তবেই ছাখ! 'এতো যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে। সেকথা কখন হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে?...কবির কাছে। কবির আর কী সম্বল বল? কল্পনা ছাড়া।...কিন্তু মজা এই নিজের মুখটা তো কেউ দেখতে পায় না? তাই ওই হঠাৎ

জ্বলে ওঠা আলোটাও দেখতে পায় না। উনি ভাবেন, ওঁর আদর্শের জন্যে আটকে আছেন এখানে। ওই চাষ-বাস, ওই অনুগত ভক্তরা এদের জন্যেই ওঁর ফুলঝাঁটির আকাশবাতাস জল মাটি সব এতো ভাল লাগে। মানুষ যদি সত্যি করে কাউকে ভাল বাসতে পারে, তার সব ভাল লাগে বুঝলি ?…নইলে তোর ওই অরুণদাদুর এতো ভাল লাগে কেন ? বাজারের থলে নামিয়ে দিতেও মুখে আলো জ্বলে ওঠে কেন ?'

সাগর প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে।

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'লতুদি।'

লতু একটু মধুর হাসি হেসে বলে, 'আচ্ছা এবার থেকে লক্ষ্য করে দেখিস। দিদিমা মহা চালাক মেয়ে, তাই ওই আলোটি ঢাকতে, মুখকে যত পারেন ব্যাজার করেন ’

সাগর গাঢ় গম্ভীর গলায় বলে, 'লতুদি, তুমি আগে কেন এসব বলনি ?'

বললে তোর কী চারখানা হাত গজাতো ?'

'চোখটা গজাতো। দেখতাম—দেখতাম দাদাকে দেখলে তোমার মুখেও—'

লতু উদাসভাবে বলে, 'সে আর তোর ভাগ্যে হল না।'

তবু লতুর মুখটা এখন আলো আলোই দেখাচ্ছে কেন ? পড়ন্ত বিকেলের আলোটা এসে পড়েছে বলে ?'

সাগর অবাক হয়ে ভাবে, এই মুখ দেখেও দাদা বকুনি লাগিয়েছে। সাগর মর্মাহত গলায় বলে. 'দাদা বড় নিষ্ঠুর লতুদি।'

লতু চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়।

লতুর মুখটা হাসি হাসি। বলে, 'নিষ্ঠুর নয়।'

'নয়?'

'নারে! তুই আমার বন্ধু, তোকে বলেই ফেলি, আমি যখন ওই ওখানে পাকুড় গাছটার কাছে আসছি, প্রবালদা রিকশা থেকে নামছে। আমায় দেখে বললো, 'লতু না ? এখানে ?' আমি

বললাম, এমনি।' প্রবালদা বললো, 'এই শোনো, তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছো না?' সত্যি আমি খুব অভদ্র।...তারপরই গাড়ি এসে গেল।...

গাড়ি থেকে হাত নাঁড়লো।'

সাগর দেখলো লতুর মুখের সেই আলো আরো উজ্জ্বল হয় ছড়িয়ে পড়ছে।

সাগরের চোখের সামনের সেই হঠাৎ খুলে যাওয়া দরজাটা দিয়ে অনেক দূরের একটা দৃশ্য দেখতে পেল সাগর।...কলকাতার বাড়িব দরজায় একটা ট্যাকসি। মার বাক্স সুটকেশ ওঠানো হয়েছে তাতে, মা ফর্সা শাড়ি আর কপালে সিঁদুর টিপ পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলো। ভোলামামা তার জীর্ণ ব্যাগটি নিয়ে উঠলেন তাতে।

তবু মার মুখটা ওই দরজাটি দিয়ে দেখতে পাচ্ছে সাগর। ভোলামামার মুখটাও। আলো ঝকঝকে।

———